নিম নাখারা

মাহবুব লীলেন

প্রচ্ছদ ● নাজিব তারেক

নিম নাখারা

মাহবুব লীলেন

প্রথম পুস্তক প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৭
প্রথম ই-বুক প্রকাশ অক্টোবর ২০০৭

স্বত্বঃ মাহবুব লীলেন

ই-বুক প্রকাশক ◆ সচলায়তন

প্রচ্ছদ ◆ নাজিব তারেক
আলোকচিত্র ◆ কামাল উদ্দিন

শামীমা চৌধুরী
ছাতা ছায়া দেয় জানতাম
ছায়াও যে ছাতা হয় জানা ছিল না আমার

বৈরাত

নাটাঙ্গি

ভূমিলক্ষ্মী

প্লানচেট

অন্তর্যান

আন্ডুল

মাটি

বৈরাত

আমাকে ফোনে ডেকে তুলল পুলিশ– হ্যালো কিডা? অনন্ত বলতিছেন? পুলিশ ইস্টিশন থেইকে কথা বইলতেছি। নেন স্যারের সঙ্গে কতা কন

সকালবেলা। তখনো আমার সকাল হতে বহু বাকি। কিন্তু সংসারী মানুষদের সকাল হয়ে গেছে বহুক্ষণ। বন্ধুরা আমার এসব খবর ভালো করেই জানে। জানে যে কেনার পর থেকে আমার মোবাইল কোনোদিন বন্ধ হয়নি। কোনো এক বিশেষ ফোনের অপেক্ষায় আমি সারাক্ষণ ফোন খোলা রাখি। এজন্য অনেকেই আমার সকাল হবার আগেই বিভিন্ন ফোন থেকে ফোন করে আমার ঘুম ভাঙানোর মজাটা নেয়। মাঝেমাঝে নিজেদের ফোন থেকে নিজেরাই করে। মাঝেমাঝে অন্য কারো ফোন থেকে অন্য কাউকে দিয়ে কিংবা মজাদার কোনো ভাবী কিংবা বান্ধবী দিয়ে ফোন করিয়ে আমাকে কিছুটা কাবু করতে চায়। ...বিষয়টাকে আমি এরকমই কিছু একটা ধরে নিতাম যদি না পুলিশ অফিসার আমাকে আরো কিছু তথ্য দিতেন

বেশ দূর। বেশ কয়েক কিলোমিটার দূর। যখন পুলিশ স্টেশনে গেলাম দেখলাম বকুল বসে আছে। তার মুখ ফ্যাকাশে। নিজের নাম বলতেই পুলিশি স্টাইলে অফিসার কিছু প্রশ্ন করলেন আমাকে। তারপর একটা চিরকুট বের করে দেখালেন– দেখেন। সুইসাইড নোটে আপনাদের দুজনের নাম আর ফোন নম্বর লেখা আছে। অবশ্য তেমন কিছু না। শুধু লেখা আপনাদের সাথে যেন যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু আপনারাতো কোনো রিলেটিভ নন। স্রেফ বন্ধু। অবশ্য তার এক চাচাকেও ফোন করা হয়েছে বাড়িওয়ালার কাছ থেকে নম্বর নিয়ে। তিনি দুপুরের মধ্যেই এসে পড়বেন। তাকে বলা হয়েছে তিনি যেন ছেলের বাবাকেও খবর দেন। তিনিও হয়ত এসে পড়বেন বিকেলের মধ্যে। ...কিন্তু ঘটনা হলো কেন সে সুইসাইড করল? আপনারা কী জানেন এ ব্যাপারে? ...অত মানুষ থাকতে আপনাদের নাম কেন সে লিখে গেলো সুইসাইড নোটে? বিষয়টা পুলিশ হিসেবে আমাদেরকে অবশ্যই ভাবতে হবে

জেরা– প্রশ্ন এবং জেরা। কবে থেকে পরিচয় থেকে শুরু করে বাড়ি কোথায়– ক' ভাইবোন– কোনো প্রেম করি কি না কিংবা আগে করেছি কি না। আমার কোনো বান্ধবীর সাথে তার কোনো পরিচয় ছিল কি না। তার সাথে সর্বশেষ কবে দেখা হয়েছে। কী কথা হয়েছে। সব। সব... এবং হাবিজাবি সব। পরে জেনেছি বকুল আগে এসেছিল বলে এসব প্রশ্ন তাকে আগেই করে নেয়া হয়েছে

আমাদেরকে থাকার কথাও বলল না। যাবার কথাও বলল না। বলল ওর চাচা দুপুরের মধ্যেই এসে পড়বেন। বসেন। বসলাম। বসে থাকলাম। আমি আর বকুল। তাকেও ডেকে আনা হয়েছে ফোনে

নয়ন আত্মহত্যা করেছে। কমপক্ষে দুদিন আগে। বিষ খেয়ে। তার বাসায়। তার রুমে। সে সাবলেট থাকত সরকারি কলোনির একটি ঘরে। বাসাওয়ালা তার সবাইকে নিয়ে তিনদিন আগে বাড়ি গেছে তার কার যেন বিয়েতে। নয়ন ছিল একা। একাই সে মরার সিদ্ধান্ত নেয়। মরে। পুলিশের ভাষায় কমপক্ষে দুদিন আগে। মানে পরশু। হয়তবা দিনে। হয়তবা রাতে। পুলিশরা দিন দিয়ে দিনের হিসেব করে নাকি রাত দিয়ে করে আমি জানি না। কিন্তু পরশুর আগের দিন তার সাথে আমাদের দেখা হয়েছে। বলেছিল একটা সুসংবাদ আছে তাই আমাদেরকে মদের সাথে শিক খাইয়েছে। পুরো প্যাকেট বিড়ি কিনে খুলে রেখেছে– খা। নো প্রব্লেম। দরকার হয় আরেক প্যাকেট কিনব। পরে। যাবার সময় আমি আর বকুল দুটো করে বিড়ি পকেটে করে নিয়ে গেছি ওর প্যাকেট থেকে। সে পুরো প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বলেছে চাইলে বাকি যে আরো দু-তিনটা আছে সেগুলোও নিতে পারি। সেদিন সে এতই উদার ছিল। আমরা আর নেইনি। তার দেখাদেখি আমরাও কিছুটা উদারতা দেখিয়েছি। সম্ভবত মদ খেলে বেশ সহজেই উদার হওয়া যায়

কিন্তু সুসংবাদ কী তা বলেনি। বলেছে জানবি। অত তাড়াহুড়োর কী আছে। আমরাও আর কোনো উৎসাহ দেখাইনি। কী আর সুসংবাদ? হয় ঘুষ দিয়ে কোথাও কেরানি কিংবা ফেরিওয়ালার চাকরির খবর। নয় আমেরিকা থেকে আপা বলেছে কিছু টাকা পাঠাবে। এইতো। ব্যাস। ওর আবার এর বাইরে কী সুসংবাদ থাকতে পারে? আমরা বরং অন্য একটা খবরের মধ্যে গিয়ে বেশ আরাম পাই। আমাদের মদ জমে ওঠে। সেদিন উজ্জ্বলের বউকে নিয়ে রানা গিয়েছিল বকুলের বাসায়। বাসায় আর কেউ ছিল না। বকুল একা। বকুল তাদেরকে একটা রুম ছেড়ে দিয়েছিল সারা দিনের জন্য। কিন্তু সেই রুমের দরজায় একটা ফুটো আছে। বকুল সারাদিন–সারাক্ষণ সেই ফুটোতে চোখ দিয়ে বসেছিল। সব দেখেছে। উজ্জ্বলের বউকে ফুটো দিয়ে পুরোটা দেখেছে বকুল। এবং। এবং রানা আর উজ্জ্বলের বউ চলে যাবার পর তাকে সেই দেখার ঠেলা সামলাতে হয়েছে দু দুবার বাথরুমে গিয়ে– শালা মাইরে বাপ... বর্ণনা দিতে গিয়ে একবার পুরো একটা পেগ সে ফেলে দিলো– না শালা বলব না। বেশি বললে আমার আবার বাথরুমে গিয়ে ঠান্ডা হতে হবে

তবুও আমরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনা জেনে নিচ্ছিলাম– তারা কী কী করল। ক'বার করল। রানা কেমন পারে। সব সময় শুয়েই করেছিল নাকি অন্য কোনোভাবে...। দারুণ। সিনেমায় অভিনয় দেখার চেয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা শোনাও অনেক মজার। তাছাড়া দুজনই যখন পরিচিত তখনতো বিষয়টা আরও হিট। এবং... এর পরে রানা যদি উজ্জ্বলের বউকে নিয়ে আবার যায় তবে যেন অবশ্যই আমাদেরকে খবর দেয়। সেজন্য আমরা কেউ এক প্যাকেট বিড়ি– কেউ বকুলকে মদের অফার দিলাম। ক্যামেরা ফিট করলে ভালো ব্যবসা করা যাবে, এ কথাও বাদ গেলো না। এবং এরকম আলোচনার মধ্যে নয়নের মতো একটা ব্যাটা ছেলের কোনো খবর শুনতে যে আমাদের আগ্রহ থাকবে না তাতো সূর্য পূর্ব দিকে ওঠার মতো চিরন্তন

নয়ন বলছিল না কিছুই। শুনছিল। আসর শেষ করে বিল দেবার আগে শুধু বকুলকে জিজ্ঞেস করল– উজ্জ্বলের বউয়ের নাম শায়লা?
– মনে হয়। আমি জানি না
– ওর কোথায় কয়টা তিল আছে তা চোখ বন্ধ করলেই গুণে বলে দিতে পারি
– মানে?
আমরা সবাই নয়নকে ঠেসে ধরলাম। বকুল কিছুটা দমে গেলো। এরকম একটা মৌলিক আবিষ্কারের কৃতিত্ব আরেকজন নিয়ে গেলো? নয়ন বলল– শায়লাতো এখন অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় কন্টিনিউ এডুকেশন করছে রানার সাথে। কিন্তু ওর প্রাইমারি– হাই স্কুল আর কলেজ হচ্ছে এই নয়ন শিক্ষা নিকেতন
– কোথায়? কবে?
বকুল কিছুতেই তার কৃতিত্ব ছাড়তে চাইছিল না। কিন্তু নয়নের বর্ণনায় এক পর্যায়ে হাল ছেড়ে দিলো। এবং এই প্রথম আমরা জানলাম নয়ন কেন মেসে থাকে না। কেন সে অনেক বেশি পয়সা খরচ করে সাবলেট থাকে। যদিও বাজারে একটা কথা প্রচলিত আছে যে বাসাওয়ালির সাথে নয়নের কী যেন কী একটা আছে। সে যাই হোক। আমরা শায়লার কথা ভাবতে ভাবতে আর রানাকে হিংসা করতে করতে সেদিন ফিরলাম টাল হয়ে। নয়নের সংবাদ কিংবা হঠাৎ করে মদ খাওয়ানো কিংবা উদার হয়ে যাবার কোনো খবরই নেয়ার প্রয়োজন মনে করলাম না। তারপরতো আজকের সকাল। পুলিশের ফোন– হ্যালো কিডা...

দুপুরে এলেন নয়নের চাচা। পুলিশ স্টেশনে আমাদের সাথে আলাপ হলো। পুলিশ কী যেন মনে করল। তারপর আমাদের ঠায়-ঠিকানা লিখে নিল। একটা মুচলেকা নিল এই বলে যে এই সংক্রান্ত বিষয়ে যে কোনো প্রয়োজনে আমরা পুলিশকে সাহায্য করতে বাধ্য থাকব। তারপর বলল আপনারা যেতে পারেন

খাওয়া হয়নি কিছু। না সকালে, না দুপুরে। না আমার, না বকুলের। চায়ের দোকানে গিয়ে পাউরুটিতে কামড় দিয়ে আমি আর বকুল দুজনেই এক সাথে দুজনকে প্রশ্ন করে বসলাম– জানিস কিছু?

জানি না। আমরা কিছুই জানি না। কেন আমাদের নাম আর ফোন নম্বর সে সুইসাইড নোটে দিয়ে গেলো জানি না। ওতে কী লিখেছে তাও জানি না। পুলিশ কাগজটা দেখিয়েছে কিন্তু পড়তে দেয়নি। বেশি বড়ো না। হাতে লেখা আট-দশ লাইন
– চল যাই শালাকে দেখে আসি

বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে আমরা হাজির হলাম হাসপাতালে। নয়নকে খুঁজতে খুঁজতে মর্গে। নয়ন নয়। লাশ। লাশ নয়। কেটে ফালা ফালা করে ফেলে রাখা একটা মানুষের পচা ধড়। হা হয়ে আছে সমস্ত শরীর। একটা ভাঙা চাটাই দিয়ে ঢাকা। গরমে চর্বি গলে চিকচিক করছে
– আপনাদের লাশ? ডাক্তারের সার্টিফিকেট এনে নিয়ে যান। মুসলমানতো? যান জানাজা কইরা মাটি দেন। আল্লায় মাফ করব
নাভি পর্যন্ত দাড়ি। বসে পেশাব করলে নির্ঘাত তার দাড়িতে পেশাব লেগে যাবার কথা। গাট্টাগোট্টা চেহারার ডোম কথাগুলো বলল আমাদের দিকে তাকিয়ে
– আমাদের লাশ হবে কেন? আমাদের ফ্রেন্ড। ... কিন্তু এভাবেতো লাশ নেয়া যাবে না। সেলাই দেবেন না?
– ও আপনাদের না? তাইলে কথা বলেন ক্যান? গার্জিয়ান কই?
– গার্জিয়ান আসবে। কিন্তু কাটার পর সেলাইতো করবেন?
– সিলাই দিলে কি লাশ বেহেস্তে যাইব? সুইসাইডে মরার এমনিতেই জানাজা অয় না। জাহান্নামে যায়
– জাহান্নামের টিকিট আপনি দেন নাকি? লাশ সেলাই করেন
– ওইটা আমার ডিউটি না
– কার ডিউটি?
– অত কতা আপনাগোরে কইতে অইব? যান গার্জিয়ান নিয়া আহেন। যত্তোসব। এই সব কুসঙ্গের লাইগাই পোলাপান এই রকম আকাম করে। আবার আইছে ডিউটি শিখাইতে

বকুলের হাতে চাপ দিলাম– চল। ওর চাচা আসুক। আয় বিড়ি খাই

চার কাপ চা আর তিনটা বিড়ি শেষ হলো
– আচ্ছা শালা কি সত্যিই সুইসাইড করেছে নাকি বাসাওয়ালির স্বামী বিষ খাইয়ে ওর ঘাড়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে? তোর কি মনে হয়?
– কে জানে? ...হারামজাদা যে শায়লার মতো একটা মেয়েকে...
বকুল ক্ষেপে গেলো
– শায়লারা আর গিয়েছিল তোর ওখানে?
– গতকাল
– শুয়োরের বাচ্চা। আমাকে ফোন করিসনি কেন?
– মাত্র ঘণ্টাখানেক ছিল
– তবুও
– লাভ হতো না। কালকে আর পুরো কাপড় খোলেনি। কিছুই দেখতে পারতি না
– তা শায়লার সাথে ছিলটা কে? রানা নাকি তুই?
– ওই খানকির ছেলে। শায়লাকে আমি ছোট বোনের মতো দেখি
– তাতো অবশ্যই। ফুটো দিয়ে ছোট বোনকে ছোটবেলার মতো ন্যাংটা-নাদুস দেখো

নয়নের চাচা আমাদের দেখলেন। আমরা বিড়ি ফেলে তার দিকে এগিয়ে গেলাম। তিনি পুলিশ ক্লিয়ারেন্স নিয়ে এসেছেন। নয়নের বাবা ঘণ্টা খানেকের মধ্যে এসে পড়বেন। লাশ বহনের জন্য গাড়িও ঠিক করা হয়ে গেছে

– লাশ দেখেছেন?
– না। আমি সব ঠিকঠাক করে এইমাত্র এলাম। কোথায়?
– মর্গের বারান্দায় ফেলে রেখেছে। সেলাইও করেনি
তিনি চিন্তা করলেন
– চলো দেখি

মর্গের কাছাকাছি গিয়ে নাকে রুমাল চাপা দিলেন– আমার একটু সমস্যা আছে। তোমরা কেউ একজন গিয়ে লোকটাকে ডেকে নিয়ে আসো
আমি গেলাম। লাশের গার্জিয়ান এসেছে শুনে লোকটা তাকাল আমার দিকে– চলেন

নয়নের চাচা ঠিকাদার মানুষ। নরকের টিকিট বিক্রেতা লোকটির সাথে কথা বললেন। মানিব্যাগ বের করলেন। তারপর আমাদের ডাকলেন– তোমরা কিছু খেয়েছ? ...চলো ডাক্তারের ক্লিয়ারেন্সটা নিয়ে কিছু খাই
– লাশ?
– উনি দেখবেন। চলো
– যান অনেক দূর যাইতে অইব আপনাদের। কিছু খাইয়া লন। যা অইবার তাতো অইয়াই গেছে। বাকিটা আল্লা মালিকে দেখব ...চিন্তা কইরেন না। আপনারা খাইয়া আহেন আমি এই দিক দেখতাছি
লোকটা আমাকে আর বকুলকে উদ্দেশ্য করে বলল। বকুল কিছু বলতে যাচ্ছিল। চাচা ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন। লোকটা চলে যাবার পর বললেন– সব জায়গায় তর্ক করতে নেই। চলো

আমাদেরকে দাঁড় করিয়ে রেখে তিনি ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিয়ে এলেন। এর মধ্যে থানার সেই পুলিশও এল। তিনি কথা বললেন তাদের সাথে। বললেন– আমি যেতে পারছি না। তোমরা কিছু খেয়ে আসো। পকেট থেকে একটা পাঁচশো টাকার নোট বের করে দিলেন আমাদের। পুলিশ অফিসার মমতার সুরে বলল– প্যাথেটিক। ভেরি প্যাথেটিক। একটা বন্ধু হারানো আর ভাই হারানো সমান কথা। কী আর করবেন। সবই আল্লার ইচ্ছা। আল্লা যা করেন ভালোর জন্য করেন। যান মুখে কিছু একটা দিয়ে আসেন। আপনাদেরতো সকাল থেকেই কিছু খাওয়া হয়নি

– চুৎমারানি
বিড়বিড় করে গাল দিতে দিতে বকুল টাকাটা পকেটে ভরল– চল
হাসপাতাল গেটের বাইরে এলাম আমরা
– আচ্ছা চাচা শালা কি আবার এই পাঁচশো টাকার চেঞ্জ নেবে আমাদের কাছ থেকে?
– কে জানে? চাইতেও পারে। শালা ঠিকাদার
– চাইলেই হলো? শালা ডোমকে টাকা দিতে পারে। পুলিশকে দিতে পারে। ডাক্তারও নিশ্চয়ই নেবে।... দেবো না ...শোন খুচরা করে আমার আড়াইশো টাকা দিয়ে দে
– তুই একটা চামার

আমরা হাঁটতে হাঁটতে সুইপার পট্টিতে ঢুকলাম। খাসির মাংস ভুনা আর পরোটা আনিয়ে দু-দুটো হাঁড়িয়া শেষ করে বাইরে এসে পান খেলাম সুগন্ধি দিয়ে। আফটার অল একটা মরার কাছে যাওয়া। বেরোবার পথে বকুল আটটা স্টিক নিল। কাজে লাগবে

টলতে টলতে যখন বেরোলাম তখন নয়নের বাবাও এসে গেছেন। দূর থেকে তার হাঁসফাঁস-দাপাদাপি দেখেই বুঝেছি নয়নের বাবা। ঠিকাদার চাচা আছেন কাছে। সাথে আরো দুয়েকজন লোক। আমরা তাদের কাছে যাবার আগে নিজেরা পরীক্ষা করে নিলাম আমাদের মুখ থেকে কোনো বদ গন্ধ বের হচ্ছে কি না। ...নাহ। কোনো গন্ধ পেলাম না

বকুলের মুখে। শুধু সুগন্ধি পানের গন্ধ। তবে তাকে কিছুটা টাল মনে হলো আমার। বকুলও আমার মুখে কোনো গন্ধ পেল না। কিন্তু বলল আমি যেন ওখানে গিয়ে কোনো বাড়তি কথা না বলি

নয়নের বাবা চিৎকার করে বেড়াচ্ছেন– অসম্ভব। অসম্ভব। এ আমার ছেলে নয়। আমি একে চিনি না। তোমরা আমাকে কী বোঝাতে চাও? এই লাশ? এই কাটা ধড় আমার ছেলের? আমার নয়নের? না। ফজলু আমি তোর ভরসায় ছেলেটাকে পাঠিয়েছি এখানে। এখন... না তোর ভাবীকে কী বলব আমি। এ আমার ছেলে না। আমার ছেলে এখানকার সবার থেকে সুন্দর... ফজলুরে ফজলু..... আমার নয়ন...

এবার বসে পড়লেন বৃদ্ধ কিংবা ভেঙে পড়া মানুষটি। একটা মেয়ে এসে দাঁড়াল তার কাছে। তাকে আস্তে করে কী যেন বোঝাতে লাগল। বকুল আমার দিকে তাকাল– কুত্তার বাচ্চা ভালো করে তাকা। চোখ খুলে ফেলব। মরা বলে কথা। মনে হয় নয়নের বোন
– ভালো গুল্লি
– নয়নের বোন তোর বোন না?
– তা হলে তুই বল। আমি শুনি

কয়েকজন নয়নের বাবাকে ধরে তুলে নিয়ে গেলো একটা গাড়ির দিকে। ফজলু চাচা। মানে ঠিকাদার চাচা এলেন আমাদের কাছে। মুখোমুখি এসে একটু সরে গেলেন– মরার গাড়িতে নয়নের বাবার যাওয়া ঠিক না। উনি আপসেট হয়ে যেতে পারেন। আমার একটু সমস্যা... মরাকে একা রাখাও ঠিক না। মরার কষ্ট হয়
– আমরা যাব নয়নের সাথে
– হ্যাঁ মানে... আমার থাকা উচিত নয়নের বাবার কাছে। মানে যে কোনো সময়...
– গাড়ি এসে গেছে?
– হ্যাঁ আমরা রওয়ানা দেবো। সেলাই হয়ে গেছে। এখন চাটাই দিয়ে বেঁধে দেবে...

লাশকে সোজা রাখার জন্য চাটাইর ভেতর দুপাশে দুটো বাঁশ ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। তিন দিনের লাশ। গরমের দিন। অত দূর নিয়ে যাওয়া। এই দুটো বাঁশই নয়নকে চাটাইর ভেতর শক্ত করে রাখবে। নরকের টিকিট বিক্রেতা দাড়িওয়ালা ডোম আমাদের দিকে তাকাল– আপনেরা যাইবেন মুর্দার লগে?
– যাব
– আপনাগোর খুব নিকটের ফেরেন্ড আছিল না? ...কী আর করবেন। মনে কষ্ট আইনেন না। আল্লার মাল আল্লায় নিয়া গেছে। তার লাইগা দোয়া করেন
– উপদেশ লাগবে না চুৎমারানি। তুই গিয়ে হাত মেরে মাল বের করে তোর দাড়িতে মাখা
মনে মনে বললাম। কিন্তু বকুল কী যেন আধ্যাত্মিক কথাবার্তা শুরু করে দিলো লোকটার সাথে

রাত হয়ে গেলো হাসপাতাল থেকে বের হতে হতে। এর মাঝে কয়েকবার চোখ বুলালাম। কিন্তু নয়নের বোনকে আর দেখা গেলো না। ফজলু চাচাকে বকুল জিজ্ঞেস করল নয়নের বাবা কোথায়। বললেন তাকে এক আত্মীয়ের বাসায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। তার এখানে থাকা ঠিক না। যাবার সময় তাদেরকে নিয়ে যাবেন

বকুল আরো কয়েকটা স্টিক জোগাড় করে নিয়ে একটা ধরাল– লাভ নেই দোস্ত। গুল্লিটা ওর বাবার সাথেই যাবে। নে টান দে। হয়ত কোনো বুড়া–ধুড়াকে দেবে আমাদের সাথে দোয়া দরুদ পড়ার জন্য

কেউ না। শুধু আমরা দুজন। আর কেউ রাজি হলো না লাশের গাড়িতে উঠতে। গন্ধ। বিকট গন্ধ। সবাই সরে গেলো। নয়নের বাবা সমানে চিৎকার করছেন। আমাদের সামনে এসে বললেন– তোমরা নয়নের বন্ধু? আচ্ছা

তোমরাই বলো এইটা কি নয়ন? মোটেই না। নয়ন তোমাদের সবার থেকে সুন্দর ছিল। তোমাদের মাঝে কেউ আছে ওর মতো?
– হ্যাঁ চাচা। আমাদের মধ্যে সব চেয়ে হ্যান্ডসাম ছিল নয়ন
– তাহলে? তাহলে তোমরা কিছু বলছ না কেন? কেন ওরা একটা পচা লাশকে আমার কাছে গছিয়ে দিচ্ছে। আমার নয়ন কোথায়? এ আমার ছেলে না। তোমরা কিছু বলো। এ নয়ন না। এই ফজলু। ফজলু। শোন এরা কী বলে। এরা নয়নের বন্ধু। এরা নয়নকে চেনে। দেখ এরা বলছে এ নয়ন না

মেয়েটাকে আবার দেখলাম। গোসল করে কাপড় বদলেছে। অন্য রকম লাগছে খোলা চুলে। এখন পরেছে আগাগোড়া সাদা পোশাক। বাতাসে উড়ছে যেন মেয়েটা

একটা বডি স্প্রে পুরো লাশের উপর শেষ করলেন ফজলু চাচা। আরেকটা আমার হাতে দিলেন– মাঝেমাঝে স্প্রে করে দিও

গাড়ি ছাড়ল। ড্রাইভার এক টুপিওয়ালা-দাড়িওয়ালা তাগড়া হুজুর। মাঝ বয়স। বকুল আমার দিকে তাকাল– স্টিক খাওয়া যাবে না মনে হয়। শালা হুজুর

রাজধানী শহর পার হয়ে গেলো গাড়ি। পেছনে আমরা তিনজন। বকুল আমি আর নয়ন। মাঝেমাঝে আমরা খোলা জায়গায় এসে জানালা খুলে দিচ্ছি। আবার বাজার কিংবা জনবসতিতে এলে বন্ধ করে দিচ্ছি। হুজুর ড্রাইভার এরকমই করতে বলেছে আমাদের। বকুল একটা সিগারেট বের করে আমার দিকে তাকাল। ধরাল। হুজুর ড্রাইভার তাকাল ফিরে– ফিলটারটা বাইরে ফেলবেন ভাইজান। ...বকুল সিগারেটটা ফেলে দিয়ে সাথে সাথে ধরাল একটা স্টিক। ড্রাইভার তাকাল আবার। বলল না কিছুই। শুধু বলল– আল্লা মালিক। মাপ করো মাবুদ

মাপ করলে করুক না করলে নাই। আমরা আরেকটা ধরালাম। কিন্তু হঠাৎ করে গাড়ি থামিয়ে দিলো ড্রাইভার। নেমে এল– আপনারা সামনে আসেন
– কেন?
– আসেন। সামনে বসতে পারবেন দুজনেই
– এখানেতো অসুবিধা নেই
– পারবেন না। এখনো শুকনার নেশায় আছেন। বুঝতে পারছেন না। আসেন

আমরা সামনে এলাম। গাড়ি আবার চলল– কিছু ধরালে দুয়েক টান দিয়েন
আমি তাকালাম বকুলের দিকে। বকুল একটা স্টিক বাড়িয়ে দিলো। সে না তাকিয়েই বলল– ধরান আপনি
– আপনি না হুজুর
– লোকে তাই বলে
– এসব খান আপনি?
– এইসব কি আল্লা সৃষ্টি করেনি?
– কিন্তু আল্লাতো আবার নিষেধও করে দিয়েছে
– আল্লার আদেশ-নিষেধ শোনেটা কে?
– মানে?
– দেন। একটা টান দেই ...কে জানে ভাই আল্লা কী বলেছে আর কী বলে নাই। এই মুর্দার বাপ-চাচা অন্য গাড়িতে চলে গেলো গন্ধ সইতে পারবে না বলে। আর আপনারা বন্ধু মানুষ। একটা বন্ধু মরলে দশটা বন্ধু আছে আপনাদের। তাও যাচ্ছেন এই গন্ধওঠা মুর্দার সাথে। আমি জানি না আল্লা আপনাদের কারে কী বলেছে ...আমার চাকরি। আগে

আমি রেন্ট এ কারের গাড়ি চালাতাম। কত বরযাত্রী নিয়া গেছি। আমার কাছে বরও যা মুর্দাও তা ...আল্লা মালিক। তিনি জানেন সব

– আমি কিন্তু মুসলমান না হুজুর। আমি আকাটা মানুষ

– যে মুর্দার সাথে তার বাপ যাবে না। সেই লাশের সঙ্গে যাবার জন্য হয়ত আল্লাই আপনাকে বানিয়েছে ...আমি জানি না এইসব... ধরান দেখি আরেকটা... গান জানেন? জানলে ধরেন। মুর্দা টানার গাড়ি। ক্যাসেট প্লেয়ার রাখতে পারি না

সে নিজেই ধরল– এই যে দুনিয়া কিসেরও লাগিয়া/এত যত্নে গড়াইয়াছেন সাঁই...

গাঁজার নেশা জমেছে বেশ। তিনজন মিলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তিন-চারবার গাইলাম গানটা। হুজুরের মুখে কথার খই ফুটছে– সিনেমা দেখেন?... আচ্ছা বাংলাদেশের নায়িকারা অত মোটা হয় কেন বলেনতো? এরা কি বোঝে না যে ঘরের বউ মোটা আর পরের বউ চিকন হওয়াটাই সুন্দর?

– হুজুর হয়ে আপনি সিনেমাও দেখেন?

– হাঃ হাঃ হাঃ ভালো বলেছেন। আমি হুজুর। আচ্ছা বলেনতো আমার এই লম্বা দাড়ি আর টুপি ছাড়া আপনার সাথে আমার তফাতটা কী? এই ভাইজানের সাথে না হয় কাটা আর আকাটা একটা পার্থক্য আছে। আপনি? আপনিও কি আকাটা?

– না

– হাঃ হাঃ হাঃ আপনি একটা হুজুর। হাঃ হাঃ হাঃ আপনারতো এ গাড়িতে যাবার কথা না। আপনি মুর্দার বাবার গাড়িতে যাওয়া উচিত ছিল। ওইখানে একটা মেয়ে আছে দেখেছেন? ভালো মেয়ে। টাইট শরীর। বিয়ে হয়নি মনে হয়। বিয়াতি মেয়েরা অত স্লিম থাকতে পারে না। সুন্দর সুন্দর মেয়েগুলা বিয়ার পর পিল খেয়ে বড়ো বাজে রকমের মোটা হয়ে যায়। দেখলে চোখে ব্যথা করে

গাড়ি থামাল আবার– আসেন একবার মুর্দারে দেখে আসি। দাফনের আগে মুর্দা একা থাকলে শয়তান এসে আসর করে। তাছাড়া এই মুর্দার এখনো জানাজা হয়নি

বডি স্প্রেটা নিয়ে হুজুর লাশের গায়ে স্প্রে করে দিলো– নে বাবা সুগন্ধি মেখে নে। তোর ডেটিং হবে আজ। কিন্তু দুঃখের বিষয় হইল ফেরেস্তা কিংবা শয়তান কোথাও কোনো মাইয়া নাই। সবাই পুরুষ। কী আর করবি। দোয়া করি তুই যেন মাধুরীর মতো একটা হুরি পাস। ...শালা মাধুরী... বুড়া হয় না শালি। হাঃ হাঃ হাঃ... চলেন ভাইজানেরা চা খাই। খানকির পোলারা ফেরিতে আমাদের অপেক্ষা করবে। চলেন চা খাই

চা খেয়ে গাড়ির গতি একেবারে কমিয়ে দিলো হুজুর– আপনাদের বন্ধুর কেইসটা কী? প্রেম পিরিতি?

– মানে?

– মরল কেন? ছ্যাঁকা?

– ও ছ্যাঁকা খেতো না। ছ্যাঁকা দিত

– কৃষ্ণঠাকুর? হাঃ হাঃ হাঃ। ধরান আরেকটা। তা মরল কেন?

– কোনো কারণ জানা যায়নি। লিখেও যায়নি কিছুই

– বুঝছি। জীবনানন্দ দাশ– 'আরও এক বিপন্ন বিস্ময় আমাদের রক্তের ভেতরে খেলা করে... আমাদের ক্লান্ত করে... ক্লান্ত... ক্লান্ত করে... লাশকাটা ঘরে সেই ক্লান্তি নাই' হাঃ হাঃ হাঃ জীবনানন্দ মরেছে ট্রামের তলায় গিয়া। আর জীবনানন্দের ভূত আইসা ডাইকা নিয়া গেছে আপনাদের কৃষ্ণঠাকুররে। হাঃ হাঃ হাঃ

– আপনি কবিতাও পড়েন?

– পড়ি না। এক পাগলের গাড়ি চালাইতাম এক সময়। পাগল সারাদিন কবিতা পড়ত। বলত আমাদের সবাইরেই নাকি কোনো না কোনো সময় একবার জীবনানন্দের ভূতে ডাক দেয়। কেউ সেই ডাকে সাড়া দেয়। কেউ দেয় না।

কিন্তু সবাই ডাক পায়। কেউ একবার। কেউ বহুবার। হাঃ হাঃ হাঃ এই কবিটা মানুষের ভিতরের এত কথা জানল কী করে বলেনতো? আমার সেই পাগলা মালিক এই সব আমারে বুঝিয়ে দিয়েছে। একটা বইও দিয়েছিল। পড়ে বুঝতে পারিনি। কিন্তু সে যা বুঝিয়ে দিত তা বুঝতাম... আচ্ছা আপনাদের কারো কি কোনো কবির সাথে পরিচয় আছে? আমি কোনো কবি দেখিনি সামনা-সামনি। এরা নাকি মানুষের ভিতরের খবর বলতে পারে? ...আচ্ছা মানুষ মরার পরে কোথায় যায় এ সম্পর্কে কবিরা কিছু জানে না?
– জানলেতো আর শালারা রাস্তাঘাটে পড়ে মরতো না
– হাঃ হাঃ হাঃ ভালো বলেছেন। একটা উল্টাপাল্টা মরণ না হলে নাকি কবিদের সম্মান থাকে না। সেই জন্য জীবনানন্দ কলকাতায় ট্রামের নিচে পইড়া মরছে। হাঃ হাঃ হাঃ ট্রামের নিচে পড়ে পিঁপড়ারও মরার কায়দা নাই। কিন্তু সেই ব্যাটা গিয়ে মরেছে সেখানে। আচ্ছা রবীন্দ্রনাথ কীভাবে মরেছে জানেন?
– বুড়া হয়ে। আশি বছর বেঁচে
– নাহ। পোষাল না। আচ্ছা আপনাদের এই বন্ধু কবিতা লিখত নাকি?
– মাথা খারাপ। ও ছিল বডি বিল্ডার। গতর চর্চা করত
– এইটাও পোষাল না। তাইলে হালায় মরল কেন?
– ওই যে বললেন জীবনানন্দের ভূত
– হতে পারে। হতে পারে। থাক এইসব। আসেন মুর্দার রুহের জন্য কিছু দোয়া দরুদ পড়ি
– আমিতো মুসলমান না
– হেমান না হলেই হয়। ...দোয়ার ভাষা লাগে না। দোয়ার ধর্ম লাগে না। দুনিয়াতে কত ধর্ম। সবাই সবাইরে বলে বাতিলের ধর্ম। আল্লা মালিকই জানেন কোনটারে তিনি পাশ মার্ক দিবেন আর কোনটা করাবেন ফেল। দোয়া করেন। দোয়া করেন। মাটির মানুষ মাটিতে ফিরে যাবে এর থেকে আর বড়ো কোনো ধর্ম নাই। জেন্দা বন্ধুর মায়ার টানে মরা বন্ধুর পচা লাশ টেনে নিয়ে যাচ্ছেন... ভাইজানরে আল্লা যদি থাকে তাহলে আপনাদের কথাই শুনব। ওই যে বাপ কুত্তার বাচ্চা কান্দে তার দোয়া কবুল করব না। কারণ সে হালায় পোলার দুঃখে কান্দে না। হালায় কান্দে পোলার কামাই খাইতে পারব না বইলা। করেন। দোয়া করেন। যে আশায় সে মরেছে তার সেই আশা যেন মাবুদ পূরণ করে

হুজুর বকবক করেই চলেছে। ধরেছে। ভালো করেই ধরেছে তাকে। ধরেছে বকুলকেও। কয়েকবার বকুল হুজুরকে আর হুজুর বকুলকে ধমক লাগাল। তারপর দুজন মিলে আবার সেই গানটি ধরল– এই যে দুনিয়া কিসেরও লাগিয়া/ এত যত্নে গড়াইয়াছেন সাঁই... হঠাৎ বকুল থেমে গেলো– ওই মিয়া এটা সিনেমার গান
– সিনেমাও আল্লার পয়দা। গাও

যখন আমরা ফেরিতে পৌঁছালাম তখন মাঝরাত পার হয়ে গেছে। বকুল আর হুজুর ভাববাদী গান গাইতে গাইতে শেষ পর্যন্ত ঝাকানাকা গান শুরু করেছে। আমার ভালোই লাগছিল। দুজনেরই তাল জ্ঞান চমৎকার। সুরও ভালো। গাড়ির ঝাঁকুনির সাথে আমি দেখছিলাম নয়নের বোন নেচে চলেছে আমার সামনে। এক সময় মনে হলো মেয়েটা যেন আমার পাশে এসে বসেছে। নাহ। আমারও বেশি খাওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু মেয়েটা সত্যিই সেক্সি। আর টাইট। মানে টানটান

হুজুর আমাদেরকে গাড়ি থেকে নামতে দিলো না। বলল ঝিম মেরে পড়ে থাকো গাড়ির মধ্যে। নামলেই শুকনার গন্ধে লোকজন হৈ চৈ করে উঠবে। ...সব শালাই খায়। কিন্তু চান্স পেলে বলতে ছাড়ে না কেউ। কী দরকার

নিয়ম মাফিক একবার ঠিকাদার চাচা এসে জিজ্ঞেস করে গেলেন কোনো সমস্যা আছে কি না। হুজুর উত্তর দিলো– মাশাল্লা সব ঠিক আছে কোনো চিন্তা করবেন না। একটু পর একটা ছেলেকে দিয়ে ঠিকাদার চাচা ছয়টা কলা আর কিছু ব্রেড পাঠিয়ে দিলেন। হুজুর গাড়িতে রেখে দিলো– এখন এইগুলা খাওয়া ঠিক না... এই ডিম...
হুজুর একাই চারটা ডিম খেলো– খাও আল্লার রহমত। বকুল কয়টা খেলো জানি না। আমি খেলাম একটা। খাওয়াল হুজুর

– ভাইজান। এই যে মাত্র একটা মুর্দা নিয়া আমরা এত মাতামাতি করি। একটা মুর্দা টানতে আমাদের অত ঝামেলা। কিন্তু নদীটারে দেখছেন? কী চুপচাপ অতগুলা লাশ নিয়া যায় অথচ টেরই পায় না?
– ওই মিয়া। লাশ কই পাইলা?
– ওইতো মানুষইতো লাশ। এখানে কোন শালা আছে যে একদিন লাশ হবে না? সব শালাই লাশ। সব শালাই নিজেরে পাইলা পুইষা বড়ো করে একেকটা সুদর্শন লাশ হবার লাইগা। হাঃ হাঃ হাঃ সুদর্শন মানে নাকি কাউয়া। সেই পাগলই আমারে বুঝাইয়া দিছিল। হাঃ হাঃ হাঃ হালার জীবনানন্দই নাকি শব্দটা ব্যবহার করত। আচ্ছা কাউয়ারে সুদর্শন নামটা কি জীবনানন্দই দিছে নাকি আগে থেকেই ছিল?
– আমি বাংলার ছাত্রও না মাস্টারও না
– হাঃ হাঃ হাঃ কাউয়ার নাম সুদর্শন। এর থেকে বড়ো চুতিয়ামি আর কী হতে পারে। হাঃ হাঃ হাঃ সুদর্শন যুবক মানে কাউয়া যুবক। আর সুদর্শনা মানে কাউয়ানি। ...নাহ। মেয়েদের নামের সঙ্গে শব্দটা যায় না। ...বুঝলা সুদর্শন মানে যেমন কাউয়া। মানুষ মানেও কিন্তু লাশ। নদী এইটা জানে। তাই জিন্দা-মুর্দা সবাইরে সে একই সাথে টেনে নিয়ে যায়। নদীর কোনো ঘেন্না নাই। কোনো পিরিত নাই কারো লাইগা

হুজুর আবার একটা গান প্রায় ধরতে যাচ্ছিল। আশপাশের লোকজন এরমধ্যে তার দিকে তাকানো শুরু করে দিয়েছে। বকুলের বোধহয় হুশ হলো। হুজুরকে ঠেলা দিলো– ওই মিয়া। তুমি না মুর্দার গাড়ি নিয়ে যাচ্ছ?
– হুজুর সামলে নিল। গলা থেকে গুনগুন করে যে সুর বের হতে যাচ্ছিল হুজুর তাকে মুহূর্তের মধ্যে দোয়ায় পরিণত করল। আমাদেরও বলল দোয়া পড়তে। আমরা বিড়বিড় করে তার সাথে সুর মিলালাম। ফেরির আরো কিছু মানুষও এসে যোগ দিলো দোয়ায়। দোয়ার শেষে হুজুর একটা মোনাজাতও করল। লাশের জন্য নয়। দুনিয়ার সব মানুষকে যেন আল্লা মাফ করে দেন সেজন্য আল্লার কাছে প্রার্থনা করল সে। আমি হাত উঠিয়ে আঙুলের ফাঁক দিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলাম নয়নের বোনকে কোথাও দেখা যায় কি না। কোথাও দেখলাম না। একবার দেখলাম নয়নের বাবাকে তার চাচা ধরে নিয়ে যাচ্ছেন পেশাব করাতে। কিন্তু... মেয়েটার কি পেশাবও পায় না? একবার গাড়ি থেকে নামলে কী হতো? আমি আল্লাকে বললাম তিনি যেন একবার অন্তত মেয়েটার পেশাব ধরিয়ে দেন...

আল্লা আমার কথা শুনলেন না। ফেরি ঘাটে ভিড়ল। সকাল হয়ে গেছে। আমরা আবার চলতে শুরু করলাম। বকুল উঠে বসেই বলল– মেয়েটাকে দেখে এলাম। ওড়নাটা মাথায়। শরীর খালি। জোস
– হাঃ হাঃ হাঃ হেসে উঠল হুজুর। তুমিতো শালা একখান সরেস মাল। বুড়া হবে না কোনোদিন
বকুল কোন ফাঁকে ওদের গাড়ির কাছে গিয়ে মেয়েটাকে দেখে এসছে আমি জানিও না। আমার গা জ্বলে যাচ্ছিল। বললাম– কাজটা ঠিক হয়নি। আমরা একটা মুর্দা নিয়ে যাচ্ছি। সে নয়নের বোন। ভাই হারানোর কষ্টে তার কাপড়চোপড় এলোমেলো হতেই পারে। এই সুযোগ নেয়া তোর উচিত হয়নি
– হাঃ হাঃ হাঃ। সুযোগের অভাবে চরিত্রবান
হুজুর আবার হেসে উঠল। আমি কিছু বললাম না। হুজুর বকবক শুরু করল– করতে দে রে ভাই। করতে দে। মানুষ এইগুলা করেই ভুলে থাকে যে সেও একটা জিন্দা লাশ। করতে দে। পারলে নিজে কর। না পারলে যে করে তারে আটকাবি না

গান আর হুজুরের বকবক। একটার পর একটা স্টিক। মাঝখানে এক জায়গায় থেমে হুজুর বেশ কতগুলো স্টিক কিনল। বলল– এরকম জম্পেশ সওয়ার পাব জানলে কিছু পাগলা পানিও নিয়ে আসতাম। বকুলও সমান তালে তাল মিলিয়ে যাচ্ছে তার সাথে। মনে হচ্ছে যেন ওরাই নিজেদের পরিচিত। আমি বাড়তি মানুষ। মাঝেমাঝে দয়া করে আমার সাথে কথা বলছে দুজন

দুপুরের দিকে একটা জায়গায় গিয়ে গাড়ি থেমে গেলো। সামনে খাল। গাড়ি আর যাবে না। নৌকা দিয়ে পার করে তারপর কাঁধে করে নিয়ে যেতে হবে লাশ। আমরা নামলাম। মেয়েটাও নামল। কিন্তু দূরে। হুজুর কানে কানে বলল– অসুবিধা নেই। মেয়েটা হাঁটবে সামনে সামনে আর তোমরা তার পাছা দেখতে দেখতে যাবে

গাড়ি যেখানে থামানো হলো সেটা একটা বাজারমতো জায়গা। বোঝা গেলো নয়নের পরিবার এখানে পরিচিত। লোকজন এসে ঘিরে ধরল নয়নের বাবা চাচা আর অন্য লোকজনকে। হুজুর তাড়া দিলো– আমাকে বিদায় করে দেন গো ভাইজান

তখনও লাশ গাড়িতে। জানালা বন্ধ। কেউ কেউ জানালার কাছে এসে দেখার চেষ্টা করছে। আবার সরে যাচেছ দূরে। ঠিকাদার চাচা এগিয়ে এলেন– একটু অপেক্ষা করেন ভাই। এখানে নামালেতো সমস্যা হবে। নেবার একটা বন্দোবস্ত করে...
– কেমনে নিবেন?
– নৌকা দিয়ে খাল পার করে কাঁধে করে নিয়ে যেতে হবে
– ভ্যান রিকশা নাই?
– আছে কিন্তু ওপারেতো ভ্যান চলে না
– এক কাজ করেন। এখনতো জমি শুকনা। এখান থেকে একটা ভ্যান নৌকায় তুলে পার করে নেন। তারপর জমির উপর দিয়া ঠেইলা নিয়া যাবেন। কষ্ট কম হবে

কথাটা ঠিকাদার চাচার মনে ধরল। তিনি ছুটে গেলেন লোকজনের কাছে। হাত-পা নাচিয়ে কী যেন আলাপ করলেন। দুয়েকজনকে দুয়েক দিকে পাঠালেন। ফিরে এসে বললেন– বুদ্ধিটা ভালো। নৌকায় করে ভ্যান পার করলে ঠেলে নেয়া যাবে... কিন্তু ভাইজান...
– টাকা পয়সা নাই। এইতো?
– না না। টাকা আছে। আপনার সব টাকাই আমি দিয়ে দেবো
– তা হলে?
– গন্ধটার কী করব?... মানে আপনিতো অনেক লাশই টানেন। আপনি বলতে পারবেন
– শুঁটকি মাছ পাবেন? পুরানা শুঁটকি না। একদিনের রোদ লাগা শুঁটকি। গন্ধওয়ালা শুঁটকি?
– পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সময় লাগবে
– যদি শুঁটকি আনতে পাঠান তাহলে আমি অপেক্ষা করতে পারি। না হলে মুর্দা নামিয়ে আমারে বিদায় করে দেন

ঠিকাদার চাচা আবার দৌড়ে গেলেন জনতার কাছে। কিছু বললেন। হুজুর একটা বিড়ি ধরাল। দুয়েকজন লোক হুজুরের সাথে কথা বলতে এসছিল। আমাদের দিকেও তাকাল সন্দেহের চোখে। কিন্তু হুজুর ওদেরকে প্রায় তাড়িয়েই দিলো

ঠিকাদার চাচা ফিরে এসে বললেন লোক পাঠানো হয়েছে। যে যেখান থেকে যত শুঁটকি পায় নিয়ে আসবে। আমাদেরকে তিনি কিছু খেয়ে নিতে বললেন। আমরা না করলাম। হুজুরকে কিছু টাকা দিলেন খাওয়ার জন্য। হুজুর আমাদেরকে ডাকল। আমরা গিয়ে একটা চায়ের দোকানে বসলাম। চা বিস্কুট ছাড়া কিছু নেই। হুজুর দোকানিকে টাকা দিয়ে ডিম আনালো দুই হালি। সেদ্ধ করালো। ...লবণ দিয়ে আমরা যখন ডিম খাচ্ছি তখনই দেখলাম একেক দিক থেকে একেকজন ব্যাগে কিংবা পোঁটলায় করে শুঁটকি নিয়ে এসে হাজির হচ্ছে। একটা ভ্যানও দেখতে পেলাম গাড়ির কাছে। ঠিকাদার চাচা এগিয়ে এলেন– শুঁটকি আনা হয়েছে। যদিও কাঁচা শুঁটকি তেমন পাওয়া যায়নি। তবু মনে হয় হয়ে যাবে

লাশ নামানোর জন্য যখন এগোলাম তখন আমরাই হাঁটতে পারছিলাম না লোকজনের ভিড়ে। কিন্তু গাড়ির পেছনের ডালা খোলার সাথে সাথে ভিড় পাতলা হয়ে গেলো। হুজুর বলল– দুয়েকজন ভেতরে যান গো ভাইজানরা। মুর্দাকে তুলে নামাতে হবে। ...কেউ এল না। ঠিকাদার চাচা একে তাকে ডাকাডাকি শুরু করলেন। কিন্তু তখন লোকজন সরতে শুরু করেছে গন্ধে। বকুল লাফিয়ে উঠল গাড়ির ভেতর। নয়নের মাথার দিকে ধরে ডাক দিলো– অনন্ত...

আমি ধরলাম নয়নের পেট। গাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে লাশের পায়ের দিকে ধরল হুজুর। তিনজনে নামিয়ে আনলাম নয়নকে। ভ্যানের কাছে এসে দেখি ভ্যানওয়ালাও নেই। হোগলার চাটিতে প্যাঁচানো নয়নকে নামিয়ে রাখলাম রিকশা ভ্যানের উপর। লোকজন দূরে নাক চেপে দাঁড়িয়ে দেখছে। ঠিকাদার চাচা এগিয়ে এসে কয়েকটা শুঁটকির পুঁটুলি তুলে দিলেন আমাদের হাতে। হুজুর শুঁটকিগুলো খুলে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে দিলো নয়নের উপর– যা বাবা বডি বিল্ডার কৃষ্ণঠাকুর। বেঁচে থাকতে ডেটিংয়ের আগে গতরে মাখতি সুগন্ধি। আর শেষ ডেটিংয়ে মাখলি শুঁটকি

শুঁটকি মাখাতে মাখাতে হুজুর ভ্যানওয়ালার খোঁজ করল। সারা নাকমুখ গামছায় মুড়ে এসে দাঁড়াল ভ্যানওয়ালা। হুজুর তার কাছে দড়ি চাইল। দড়ি নেই। আবার ঠিকাদার চাচা কাউকে পাঠালেন দড়ি আনতে। হুজুর বলল– পানি আনতে। শুঁটকির উপর পানি ছিটিয়ে দিলে গন্ধ বেরোবে

দুই পাশে দুটো বাঁশসহ আমরা নয়নকে বাঁধলাম ভ্যানের সাথে। তার উপরে এখন ছোট-বড়ো শুঁটকি মাছ। হুজুরই ভ্যান টানা শুরু করল। খালের সামনে একটা নৌকা দাঁড় করানো ছিল। হুজুর কয়েকজনকে খালের অন্য পাড়ে পাঠাল সাঁকো দিয়ে। তারপর ডাক দিলো– তিনজনে হবে না। লোক লাগবে আরো। ভ্যান তুলে নৌকায় নামাতে হবে

আমরা তিনজন। ভ্যানওয়ালা। ঠিকাদার চাচা। আরো দুজন। এর বেশি পাওয়া গেলো না। এই সাতজনে মিলে ভ্যানটাকে নামালাম নৌকায়। হুজুর উঠে এল। আমরা দুজন ছাড়া বাকিরাও নেমে এল নৌকা থেকে। উঠে ওরা পাড়ে দাঁড়িয়েছিল। হুজুর তাদেরকে তাড়িয়ে সাঁকো দিয়ে অন্য পাড়ে পাঠাল। নৌকা ছাড়লে মাঝি ছাড়া নৌকায় নয়নের সাথে থাকলাম আমি আর বকুল

হুজুর আগেই পৌঁছে গেছে অন্য পাড়ে। একই কায়দায় তোলা হলো ভ্যান। টেনে একটু দূরে নিয়ে রাখা হলো। হুজুর ঠিকাদার চাচার সাথে লেনদেন শেষ করে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। আঙুল তুলে দেখাল– ওই দেখো
দেখলাম আরো অনেকের সাথে মেয়েটাও হাঁটতে শুরু করেছে গ্রামের রাস্তা দিয়ে। হুজুর বলল– যাও। ওই জিন্দা মাইয়াটারে দেখে দেখে বস্তুরে ডেটিংয়ের ঠিকানায় পৌঁছাইয়া দিয়া আসো। পকেট থেকে চারটা স্টিক বাড়িয়ে দিয়ে ঠেলে ভ্যানটা চালু করে সাঁকোর দিকে এগিয়ে গেলো হুজুর। কড়া দুপুরের রোদ মাথায় নিয়ে আমরা চলতে শুরু করলাম নয়নের সাথে

এর আগে বোধ হয় এ রাস্তায় কোনো ভ্যান বা রিকশা যায়নি। মূলত ফসল কাটা জমি। মাঝেমাঝে পায়ে হাঁটা রাস্তা। সম্ভবত বর্ষায় পুরোটাই পানির নিচে থাকে বলে এখানকার লোকজন রাস্তার কথা ভাবে না। কিংবা রাস্তা দিয়ে ভ্যান বা রিকশা চলার কোনো দরকার নেই বলে ব্যবস্থা করার কথাও ভাবেনি তারা। সবাই-ই আগে আগে। আমি আর বকুল ভ্যানের পেছনে। ঠেলছি এবং ধরে আছি। ঠিকাদার চাচা কিছুক্ষণ চেষ্টা করলেন আমাদের পাশাপাশি হাঁটার। তারপর– তোমাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে নাতো ভাতিজারা? বলে আমাদের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকালেন। আমরা কোনো উত্তর দিলাম না। তিনি সামনে হাঁটা লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে– আমি একটু দেখি ভাইজান কী করছেন। বলে প্রায় দৌড়ে চলে গেলেন নয়নের বাবা আর সবাই যেখানে হাঁটছেন সেখানে

বকুল এর মধ্যে সবার সামনেই একটা স্টিক ধরিয়েছে। নয়নের গন্ধ– স্টিক আর শুঁটকি। এক অদ্ভুত আবেশ। আমার নিজেকে কেমন নির্লিপ্ত মনে হলো। কোনো গন্ধই আর আলাদাভাবে আমার নাকে আসছে না

ভ্যানওয়ালা মাঝেমাঝেই থেমে গামছা ফাঁক করে ওয়াক করে থুতু ফেলছে আর ঘেন্নায় তাকাচ্ছে আমার আর বকুলের দিকে– হুনছি টাউনে লাশেরে মজবুত কইরা বাইন্ধা দেওনের কী একটা কায়দা আছে। আপনেরা সেইটা করতে পারলেন না?
– গাঁজা খাবেন?

– নাউজুবিল্লাহ

ভ্যানওয়ালা আরেকবার থুতু ফেলল– পোলাপানগো টাউনে পাঠানের কামটাই বা কী? পড়ালেখা করব। পড়ালেখা যে কয়জন করে তাতো জানাই আছে। বেশিরভাগই টাউনে যাইয়া শিখে গু-মুত খাওন আর মাইয়াগো পিছে দৌড়ান। এর লাইগাই এইগুলান অয়। বুড়া বাপের কান্ধে লাশ অইয়া আবার ফিরতে অয় গ্রামে। ...ক্যান টাউনে কোনো মাইয়ার বাপ কবরের জায়গা দিলো না?
– ও মেয়েদের জন্য মরেনি
– জানা আছে। কী জন্য মরছে তা কি আর কেউ কয়? শরমের কথা। কইলে ময়-মুরব্বি গরই বেইজ্জতি
– যা সত্য না তা বলবেন কেন?
– হুনেন মিয়া। বেশি কতা কইয়েন না। উল্টাপাল্টা কিছু কইরা না মরলে ওরে কাটাছিরা করব ক্যান? দেশে কি মানুষ কম মরে? কই তাগোতো আর এমুন কইরা কাটে না? ...এমুন করলে অইব না। জোরে ঠেলা দেন। শইলে শক্তি থাকব কেমনে? খানতো মদ-গাঞ্জা আর গু-মুত

ভ্যানের চাকা একটা গর্তে ঢুকে গেছে। এরজন্য ভ্যানওয়ালা আমাদেরকে নাকি নয়নের শহরে যাওয়াকে দায়ী করছে বোঝা না গেলেও তার সমস্ত রাগ যে এখন আমাদের উপর তা বোঝাই যাচ্ছে। দুজনে ভ্যানের পেছন দিকটা শূন্যে তুলে গর্তটা পার করলাম। বকুল আবার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। আমি তাকে সামলানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু ভ্যান আবার একটু স্মোথ জায়গায় পড়তেই বকুল ফুসে উঠল – লাশ টানতে পারবেন না বললেই হতো। এখন মুর্দার সামনে এমন বকবক করেন কেন?
– এ্যাঁ লাশ। এরে লাশ কয়? লাশ অইলে পোলার বাপ–আত্মীয়কুটুম এমুন দূরে দূরে হাঁটতো না... আপনেরা কারা?
– মানে?
– আপনেরা লাশের কী হন?
– বন্ধু
– ইশ্‌রে। দোস্ত। কুসঙ্গ দিয়া দোস্তরেতো শুঁটকির নিচে ঢুকাইছেন। আবার এখন কোন মতলবে অতদূর আইলেন?
– মতলব আবার কিসের?
– টাউনে থাকেন বইলা নিজেরে অত বুদ্ধিমান মনে কইরেন না। অবশ্যই কোনো মতলব আছে। নাইলে এই কষ্ট করার ঠেকা পড়ছে ক্যান?

বকুলকে বললাম রেস্ট নিতে। আমি একাই ঠেলব। বকুল একটু পেছনে স্টিক ধরিয়ে হাঁটতে থাকল। আমি ঠেলছি। একটা জমির আল পার হতে গিয়ে ভ্যানটা কাৎ হয়ে গেলো। আমি ঝট করে ভ্যান ছেড়ে ঠেলে ধরলাম নয়নকে। কিন্তু... কিন্তু... হোগলা পাতার চাটাই ভেদ করে আমার আঙুলগুলো ঢুকে পড়ল নয়নের দেড়-দুই ইঞ্চি ভেতরে। অন্য হাত দিলাম। সেটিও। ভ্যান কাৎ হয়ে আছে। আমি ঠেলে ধরে আছি ভ্যানেবাঁধা নয়নকে। থিকথিক করছে নয়নের শরীর। আমার আঙুল ডেবে যাচ্ছে আরো। চেষ্টা করছি ঠেলে তোলার। কিন্তু আমার হাত বেয়ে নেমে আসতে শুরু করেছে ঘন পচা চর্বির স্রোত। কনুই পর্যন্ত পচা চর্বি আসতেই চিৎকার করে বকুলকে ডাকলাম। বকুল দৌড়ে এসে নয়নকে ধরল। দেখলাম হোগলার চাটাই ভেঙে ওরও দশটি আঙুল ঢুকে গেলো নয়নের ভেতর। বললাম– ভ্যানে ধর। ভ্যানে ধর। বকুল ভ্যান ধরে ঠেলা দিলো। আমি নয়নকে। ভ্যান আবার উঠে চলা শুরু করল। দেখলাম নয়নের চর্বি থিক থিক করে আমার কনুই পর্যন্ত চলে গেছে। কেমন যেন চুলকাচ্ছে। বকুলের অবস্থাও এক। তার হাতে চামড়ার বেল্টের ঘড়ি ছিল। ঘড়ি খুলল। ঘড়ির বেল্টে নয়নের চর্বি। বকুল ঘড়ির বেল্টটা মাটিতে ঘষে শুকিয়ে আবার পরল। আমি কিছু খড় নিয়ে হাত মুছলাম। কিন্তু হাতে দাগ লেগেই থাকল নয়নের গলা চর্বির
– শালা অত ব্যায়াম করলি তাও তেল কমলো না? একেবারে মালের মতো বেরোচ্ছে

লাশটা ফুলে হোগলার চাটাইয়ের সাথে একেবারে খাপেখাপ হয়ে গেছে। আরো দুয়েকবার আমাদের আঙুল ঢুকে গেছে নয়নের ভেতর। ঠিকাদার চাচা কিংবা অন্য কেউ আমাদের কাছে আসেনি। পাশ কেটে যারা গেছে তারা জমির মধ্যে নেমে দূরে দূরে হেঁটে চলে গেছে

বেশ দূর থেকে বাড়িটা দেখা যায়। দেখেই চিনলাম। নয়নের বিয়েতে এ বাড়িতে আমাদের সবার আসার কথা ছিল। চারপাশে ধানক্ষেতের মাঝখানে গোল করে একটা উঁচু জমি। জমির চারপাশে গাছ আর বাঁশ। উঠানের চারপাশ ঘিরে নয়নের সাত বাপ-চাচার ঘর। একপাশে
রাস্তা। পেছনে পুকুর। বাড়িটা নয়নের বর্ণনার সাথে একেবারে মিলে যায়। রাস্তাটি সোজা উঠে গেছে বাড়ির উঠানে। আমরা যখন বেশ দূরে তখন পুরো উঠানেই ছিল অসংখ্য লোক। আমরা যত এগোতে থাকলাম লোক তত দূরে সরে যেতে থাকল। অবশেষে যখন পৌঁছালাম বাড়ির ভেতর, ভ্যানওয়ালাও ওয়াক করে থুতু ফেলে দাঁড়িয়ে থাকল পাশে

উঠানে একটা খাটিয়া ছিল আগে থেকেই। ভ্যানওয়ালা আর আমরা নয়নকে নামিয়ে রাখলাম খাটিয়ায়। ঠিকাদার চাচা জানালেন লাশের গোসল হবে বাড়ির বাইরের জমিতে। কিন্তু খাটিয়া ধরার জন্য অন্তত চারজন মানুষতো লাগে। তিনি নিজে দিলেন একটা কাঁধ। ভ্যানওয়ালাকে লাগালেন সওয়াবের কথা বলে। আমি আর বকুলকে বললেন না কিছুই

বেশ দূরে জমিতে খাটিয়া রেখে আমি আর বকুল হাঁটতে শুরু করলাম বাড়ির দিকে। বাড়ির লোকজন আমাদের দিকে খুব একটা তাকাচ্ছে না কেউ। ভেতর বাড়িতে কান্না। সব ঘরেই মানুষের আসা যাওয়া। আমরা নয়নের বর্ণনা মনে করে বাড়ির পেছন দিকে চলে গেলাম হাঁটতে হাঁটতে। পুকুর পাড়ে। বকুলকে বললাম– স্টিক আছে?
বকুল পকেট থেকে বের করে দিলো– একটাই। ধরা

পড়ন্ত বিকেলে শেষ স্টিকটা শেষ করলাম দুজন। পুকুর ঘাটে এই পর্যন্ত আর কাউকে আসতে দেখলাম না। বকুল উঠে গেলো। পুকুর পাড়ে শুকানোর জন্য একটা লুঙ্গি–দুটো শাড়ি– দুটো শার্ট আর কয়েকটা পেটিকোট ব্লাউজ ছিল। বকুল লুঙ্গি আর একটা শাড়ি নিয়ে এল। শাড়িটা আমাকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল– এটা পরে গোসল করে ফেল। নিজে লুঙ্গিটা পরে নেমে গেলো পুকুরে। আমিও শাড়িটাকে লুঙ্গির মতো করে পেঁচিয়ে নেমে গেলাম। সাঁতার কাটলাম। বকুল তার ঘড়ি খুলল। নাকের কাছে আনল। গন্ধে নাক সরিয়ে নিল আবার– দোস্ত। তোর বিয়েতে আসলেতো কিছু না কিছু দিতেই হতো। যা এটাই আজ তোকে গিফট করলাম

ঘড়িটা পুকুরের মাঝখানে ছুঁড়ে ফেলল বকুল

সন্ধ্যা প্রায় হয়ে গেছে। গোসল করে আমরা আর বাড়ির দিকে গেলাম না। কারো কথাই ভাবলাম না। থেকে থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম একটা নারীকণ্ঠের কান্না। এই কণ্ঠ সেই নারীর। লাশ নিয়ে বাড়িতে ঢোকার সাথে সাথে যে নারী সবাইকে ডিঙিয়ে আছড়ে পড়েছিল নয়নের উপর। একমাত্র যে মানুষটি নয়নের শরীরে কোনো গন্ধ পায়নি আজ। তিনি নয়নের মা

আমি আর বকুল হাঁটতে থাকলাম শহরে ফিরে যাবার রাস্তায়
২০০৫.০৬.২১

নাটাঙ্গি

এই রাজধানীতে কলাবাগান আমাদের একটা গেটওয়ে। সারাদিন আচ্ছামতো ক্লান্ত হয়ে কিংবা ইচ্ছামতো ঘুমিয়ে সন্ধ্যায় সবাই হাজির হয় কলাবাগান। লোকজন বলে আড্ডা। কিন্তু আমাদের কাছে বিষয়টা দুরকম, প্রথমত পরের দিনের ঘানি টানার আগে চেঞ্জওভার। দ্বিতীয়ত উন্মুক্ত এক্সচেঞ্জ অফিস। সর্ব বিষয়ক সার্ভিস অ্যান্ড ইনফরমেশন অ্যান্ড সাপোর্ট অ্যান্ড প্লানিং অ্যান্ড কাউন্সিলিং সেন্টার। নিজেরাই নিজেদের জন্য এইসব করি আর নিজেরাই অন্যদের দিয়ে এইসব করাই। যে কয়েকজন এই কলাবাগান আড্ডা সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা এবং স্থায়ী সদস্য। তার মধ্যে সুমন আর আমিও আছি। সুমন মানে সুমন আনোয়ার। মঞ্চে অভিনয় করে আর টিভির জন্য নাটক বানায়

দু হাজার পাঁচের অক্টোবরের শেষ দিকে একদিন কলাবাগান যেতেই সুমন দু-তিন পাতার একটা ফটোকপি বাড়িয়ে দিলো– হাসান আজিজুল হকের শত্রু গল্পটা পড়েছেন?
– না
– এইটা পড়ে দেখেন
পড়ে দেখার কথা বলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সে নিজেই গল্পটা বলা শুরু করে। এটা ওর একটা টেকনিক। কোনো কঠিন কাজে রাজি করানো কিংবা বেগার খাটানো অথবা কারো পকেট থেকে টাকা বের করার কিছু ইউনিক টেকনিক সে জানে। বুঝতে পারছিলাম শুধু শুধু সাহিত্য প্রেম থেকে সে আমার জন্য গল্পটা কপি করে আনেনি। অন্য কোনো ধান্দা আছে

ইমোশনে কাঁপতে কাঁপতে– চেহারা ত্যাড়াব্যাঁকা করে– হুদাকামে হাত পকেটে ঢুকিয়ে এবং বের করে– খামাখা একই জায়গায় দু-তিনটা চক্কর দিয়ে– পায়ের নিচের ঘাস-পাথর এইসব পড়ে থাকা নিরীহ জিনিসগুলোকে লাথি মেরে সুমন গল্প শেষ করে মূল বক্তব্যের ভূমিকা টানল– গল্পটা আমি বানাব

কলাবাগানের আড্ডায় আমিই একমাত্র মিডিয়ার বাইরের লোক। বাকি যারা আসে তারা হয় মিডিয়া করে না হয় করায় অথবা করবে। সুতরাং মিডিয়া ইনফরমেশনের দিক থেকে এখানে সর্বনিম্ন আনাড়ি আমি নিজে। তাছাড়া আমি টিভি দেখি না। টিভি নেই আমার। রাস্তাঘাটে– বাসস্ট্যান্ডে কিংবা কারো বাসায় এক চামচ দু চামচ করে সারা জীবনে যতটুকু টিভি দেখেছি তা এক জায়গায় জড়ো করলে দু ঘণ্টার প্রোগ্রাম হবে কি না সন্দেহ আছে। ফলে যখন আমার সামনে কেউ এই বিষয় নিয়ে আলাপ করে তখন আমি ওইসব ঘটনার কাউকেই চিনি না। কিন্তু ঘটনাচক্রে যখন কলাবাগানের বাইরে কোথাও মিডিয়া সম্পর্কে আলাপ করতে হয় তখন লোকজন এ বিষয়ে আমাকে একজন পাতি বিশেষজ্ঞ হিসেবেই বিবেচনা করে। এর প্রথম কারণ মিলন। আনিসুর রহমান মিলন। সে নাকি মাসে আটাশ দিন শুটিং করে আর প্রতিদিন তার আট-দশটা অভিনয় দেখা যায় সাত-আটটা চ্যানেলে। কিন্তু একবার একটা প্রিমিয়ার শো ছাড়া আমি জীবনেও তার কোনো অভিনয় দেখিনি। মিলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সারাদিনে সে যা যা করে কলাবাগানে এসে জনে জনে তা বর্ণনা করে। একই লোককে সে একই কাহিনী চার-পাঁচবারও শোনায়। মিলনের বর্ণনায় পঞ্চাশভাগ থাকে নিজের প্রশংসা। বাকি পঞ্চাশভাগ অন্যদের বদনাম। কোন আর্টিস্ট বেশি পাউলি দেখায়। কারা সারারাত মোবাইলসেক্স করে দিনে ক্যামেরার সামনে ঘুমায়। কোন ডিরেক্টর পয়সা কম দেবার সময় কী আচরণ করে। কোন ডিরেক্টরের নাটক ক্যামেরাম্যানরা বানিয়ে দেয়। কোন নাট্যকার অন্যকে দিয়ে লিখিয়ে নিজের নামে চালায়। কোন পারফরমার পয়সা পেলে থ্রিএক্স গ্রেডের নাটকেও অভিনয় করবে। কোন আর্টিস্ট দুপুরের খাবার খেয়েই বলে যাইগা। সব। শুধু ডিরেক্টর পারফরমারই নয়। তার বদনামপর্ব থেকে টিভি স্টেশনের লোক– মিডিয়া সাংবাদিক– প্রডিউসার এমনকি স্পটবয় পর্যন্ত কেউই রেহাই পায় না

আমি মিডিয়াতে কাজ না করেও মিলনের কল্যাণে মিডিয়ার কমপক্ষে এক হাজার লোকের আচার আচরণ–বৈশিষ্ট্য–পরকীয়া–কিপটামি–বাটপারি এমনকি কার বাড়িতে কে কে আছে। বিয়ে করেছে কি না। ছেলে মেয়ে কয়টাসহ বাড়ির ঠিকানাও বলে দিতে পারি। ব্যাপারটা নতুন নয়। মিলন একসময় একটা এনজিওতে কাজ করত। এখনও সেই এনজিওর ডিরেক্টর থেকে পিয়ন পর্যন্ত সবার কাহিনী আমার মুখস্থ। শুধু মাঝখানে সে কিছুদিন একটা ব্যাংকে জয়েন করেছিল। তখন আমি ঢাকার বাইরে থাকার কারণে সেই ব্যাংকের কারো সম্পর্কে আমার কিছু মুখস্থ হয়নি। কিন্তু কলাবাগানের অন্যরা নিঃসন্দেহে সেই ব্যাংকের লোকজনের বর্ণনাও দিতে পারবে। ...শুধু আমি কিংবা আমরা নই। আশেপাশের দুটো পানের দোকানদার এবং সেই পথে নিয়মিত যাতায়াত করা গার্মেন্টসের শ্রমিকরাও ইচ্ছে করলে মিলনের কাহিনীগুলো বলতে পারবে। কারণ মিলন বলার সময় গলা চড়িয়ে রাজনীতিবিদদের মতো জাতির উদ্দেশ্যেই কথাগুলো বলে

আমার দ্বিতীয় সোর্স একটা শিক্ষার দোকান, যেখানে টিচার থেকে এ্যাকাউন্টেন্টের সংখ্যা বেশি। সারা মাসে যতটা নোটিস তারা দেয় তার নিরানব্বই ভাগ থাকে টাকা আদায় নিয়ে আর একভাগ থাকে ক্লাস নিয়ে। তারা নিজেরা এটাকে বলে ইউনিভারসিটি। আমরা বলি এডুকেশন শপ। জাতে উঠার জন্য পাড়ার লন্ড্রি–সেলুন–কসাইখানা কিংবা মুদি দোকানের নামের সাথে যেমন কেউ কেউ লাস ভেগাস– ক্যালিফোর্নিয়া– লস এঞ্জেলস জাতীয় একটা বিদেশি নাম জোড়া দিয়ে দেয়। ঠিক তেমনি এই দোকানের সাথেও স্ট্যামফোর্ড নামে একটা বিদেশি জায়গার নাম জুড়ে দেয়া আছে। কে জানে ওই জায়গাটা কোন দেশের কোন টানবাজার না কান্দুপট্টি

দুই বছর ধরে আমি এই দোকানের নিয়মিত খদ্দের। লেখার সময় লিখি মাস্টার্স করছি ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়ায়। যদিও সেখানে আমরা ক্যামেরার প্রাকটিক্যাল ক্লাস করি হোয়াইট বোর্ডে ক্যামেরার ছবি এঁকে। ফিল্ম এডিট করি সাদা কাগজে আর ডিরেকশনের পরীক্ষা দেই মুখে বর্ণনা করে

এই দোকানের বান্ধা কাস্টমার হবার পর থেকে নিজের তাগিদে আমরা কিছু বইপত্র বা ইন্টারনেট ঘাঁটাঘাঁটি করি। কিছু খোঁজ খবর নেই বাংলাদেশের ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়া ফিল্ডের, বাংলাদেশের সেন্সর ল টা কেমন। অশ্লীলতা বিরোধী আইনটা কী? এইসব আরকি। ফলে বিশেষজ্ঞীয় পর্যায়ের আলাপে লবণ দেবার মতো আরো দুয়েকটা বিদ্যা আমার পেটে অটোমেটিক্যালি জমা হয়ে গেছে মিলনীয় জগতের বাইরেও

মিলন প্লাস শিক্ষার দোকান থেকে কেনা বিদ্যা ঘেঁটে আমি বললাম– এই নাটক কেউ চালাবে না সুমন
– না চালাক। সবকিছু চালানোর জন্য বানাতে হবে নাকি? এইটা আমি বানাব আমার জন্য
এটা সুমনের ঘাউড়া ড্রিমের আরেকটা অংশ। মাস্টার প্লান ছাড়া ওর কোনো প্লান নেই। এবং সব প্লানের সাথেই অনিবার্য ঘাউড়ামি। কারো কোনো কথাই সে কানে তোলে না এইসময়। এবং যথারীতি কিছুদিন পর এইসব প্লান প্লানের জায়গায়ই থাকে। সুমন বসে বসে ঝিমায় কলাবাগানে

দীর্ঘদিন থেকে সুমনের মাস্টার প্লানে আমি কোনো কথা বলি না। এবং আমাদের কোনো প্লানিংয়ে যখনই সুমন ঢুকে পড়ে তখন ধরে নেই আলাপটা আর এগোনোর কোনো মানে হয় না। কারণ সাধারণ প্লানকে মাস্টার প্লানে নিয়ে মেরে না ফেলা পর্যন্ত সুমন নিস্তার দেবে না। তবে মাঝেমাঝে তার মাস্টার প্লানকে সুপার প্লানে নিয়ে যাবার জন্য দুয়েক চামচ গুড় যে আমি দেই না তা অবশ্য নয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রটা ভিন্ন। আমি অনুমান করতে পারছিলাম সুমন এই মাস্টার প্লানে আমাকে প্যাঁচানোর একটা টেকনিক্যাল প্লান অলরেডি করে ফেলেছে। যদিও ধরতে পারছি না কিন্তু বুঝতে পারছি সামনে বেশ কয়েকটা দিন সে আমাকে ঘাঁটাবে। ...নতুন ডিরেক্টরদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে ভয়াবহ যে অস্ত্র সেটা আমি ছাড়লাম এবার– এ নাটকের প্রডিউসার পাবে কোথায়? কেউ রাজি হবে না
– প্রডিউসার রাজি
– ধ্যাৎ
– আল্লার কিরা

– কে?
– সাচ্চু ভাই
যুক্তির জায়গা শেষ। সাচ্চু ভাই মানে শহীদুল আলম সাচ্চু। অভিনেতা। মঞ্চে নির্দেশনা করতেন। বহুদিন মঞ্চের সাথে নেই। এই মানুষটার কিছু দুমুখো যোগ্যতা আছে। যা তাকে একবার উঠায় আবার নামায়। তার হাতের কুড়াল জঙ্গলের গাছ কেটে যেমন নতুন বাড়ি বানায় আবার সেই কুড়ালই তার বাড়ি কেটে আবর্জনা বানিয়ে দেয়। তার মূল ঝামেলা একরোখা ইমোশন। আগামাথা কোনোকিছু না ভাবা এবং আশপাশের কোনো কিছু না শোনা। ...অনেক কিছু করে এবং শেষ করে তিনি এখন একটা মিডিয়া প্রডাকশন হাউস করেছেন। তিনিই প্রডিউসার। সুতরাং সুমনকে কিছু বলার আর মানে নেই। আমার মা একটা প্রবাদ বলেন– উন্দা পুরুষ আর ঘোমটা নারী সব সময় ডেঞ্জারাস। যারা হাঁটার সময় ঘাড় নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটে তাদেরকে সিলেটি ভাষায় বলে উন্দা। সাচ্চু ভাই এবং সুমন দুজনই মূলত উন্দা পুরুষ
– উস্তাদ আপনি আমারে এইটার স্ক্রিপ্টটা কইরা দিবেন
সুমন তার ভূমিকাপর্বের শেষ বাক্যটা ছাড়ল
– দেখি। পড়ে দেখি। যদি হয় তাতেও সময় লাগবে
– লাগুক সময়। আপনে টাইম নেন
– আমি না হয় করলাম। কিন্তু গল্পটা দিয়ে নাটক বানাতে হলে হাসান আজিজের পারমিশন লাগবে। সেটা কে নেবে?
– ওইটা নিয়ে ভাইবেন না। সেইটা আমি ব্যবস্থা করব
– ঠিক আছে কিন্তু দেড়-দু মাসের আগে মনে হয় না কিছু হবে

বহু মানুষেরই বহু মাস্টার প্লানের সঙ্গী আমি। ওসব মাস্টার প্লানে আমারও কিছু কিছু তথাকথিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার কথা থাকে। সময়ে আমিও সেগুলো করি না এবং যাদের মাস্টার প্লান তারাও ভুলে যায় যে আমার কিছু করার কথা ছিল। এসব ক্ষেত্রে গা বাঁচানোর সবচেয়ে বড়ো উপায় কিছু সময় নেয়া। সেই হিসাব থেকেই আমি দেড়-দু মাসের এই ফিরিস্তি দিলাম। আমি জানতাম দুয়েক সপ্তা পরেই এই কারেন্ট পানসে হয়ে যাবে

বাসায় এসে গল্পটা পড়লাম। সুমনকে বলা দু মাস সময়ের কথা মনে পড়ল। এখন মনে হলো এই গল্পটাকে নাট্যরূপ দিতে গেলে সত্যি সত্যি দু বছরও হয়ত কম সময়। কারণ গল্পটা থেকে দৃশ্য বের করা আর ভিজুয়াল ইনস্ট্রাকশন দেয়া সত্যিই কঠিন একটা কাজ হবে। আবার একটা লোভও তৈরি হলো নিজের ভেতর। সুমনের কাছে রাজি হয়নি। কিন্তু গল্পটা পড়ে নিজের কাছেই রাজি হয়ে গেলাম– করব। যতদিনই লাগুক গল্পটাকে নাট্যরূপ দেবো আমি। কারণ আমার জানামতে এই প্রথম হাসান আজিজ একটা গল্পে মুক্তিযোদ্ধাদের মানসিক ক্রাইসিস নিয়ে কথা বলেছেন। যুদ্ধের অনিবার্যতার পাশাপাশি মানুষের মানবিক উচ্চতা– ভেতরের ক্ষরণ আর মৃত্যুকে নিয়ে এসেছেন এক কাতারে। ...মাঝরাতেই সুমনকে ফোন করলাম– আমি গল্পটা নাট্যরূপ দেবো

কবে দেবো কীভাবে দেবো জানি না। ঘুমুতে গেলাম। ঘুম এল। কিন্তু আবার ফিরে এলাম আধা জাগরণে। আমি পুরো গল্পটার নাট্যরূপ দেখতে থাকলাম দৃশ্যের পর দৃশ্য ধরে। পুরো ঘটনা। হাসান আজিজের শত্রু গল্পটা নাটক হলে যেমন হবে ঠিক সেরকম। সকাল পর্যন্ত। ঘুম ভেঙে এক বৈঠকে তৈরি করে ফেললাম ড্রাফট। শেষ করে গল্পের সাথে মিলালাম, ভুল বোঝার জায়গা আছে কি না কোথাও। কোথাও হাসান আজিজকে ছোট করছি কি না। কোথাও কি এমন কোনো গ্যাপ থেকে গেছে যা দেখে মানুষ গল্পকার হাসান আজিজকে ভুল বুঝতে পারে। মনে হলো কোথাও কোথাও কিছু ফাঁক রয়ে গেছে। ...দৃশ্য বদলালাম। সংলাপ বাড়ালাম। কমালাম

হাসান আজিজুল হকের শত্রু গল্পটা দু দিক থেকে বিপজ্জনক। গঠনের কারণে যেমন নাট্যরূপ দেয়া বিপজ্জনক। তেমনি বিষয়ের কারণে বিপজ্জনক রাজনীতি ব্যবসায়ী আর স্বঘোষিত রাজনীতি বোদ্ধাদের কথা বিবেচনা করে

বাংলাদেশের কোনো এক গ্রামে মুক্তিযুদ্ধের সময় কোনো এক পাকিস্তানি সিপাহি কোনো এক কারণে অস্ত্রসহ একা ঢুকে পড়ে এক বিকেলে। গ্রামের লোকজন যখন তাকে ঘিরে ধরে তখন বিনা বাক্যে সে অস্ত্রটা তাদের হাতে তুলে দেয়। লোকজন যখন তার হাত বাঁধতে চায় তখন সে হাত দুটো বাড়িয়ে দেয় বাধ্য ছেলের মতো। গ্রামের লোকজন পড়ে ফাঁপড়ে। সিপাহিটা এমন কোনো আচরণ করছে না যাতে রেগে গিয়ে তাকে কুপিয়ে মেরে ফেলা যায়। কথাও বলছে না। লোকজন বহুভাবে তাকে রাগানোর চেষ্টা করে যখন ব্যর্থ হয় তখন তাকে একটা স্কুল ঘরে বেঁধে রাখে। সিদ্ধান্ত হয় নিজেরা খুনখারাবিতে না গিয়ে কাছাকাছি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে খবর দিয়ে তাকে ওদের হাতেই তুলে দেয়া ভালো। যা করার ওরাই করবে

পরের দিন মুক্তিযোদ্ধা খলিল তার জুনিয়র যোদ্ধা এবং শত্রু গল্পের কথককে নিয়ে এসে গ্রামবাসীর কাছ থেকে সিপাহিটাকে গ্রহণ করে। গেরিলা যুদ্ধের নিয়ম অনুযায়ী দুজনের টিমে সিনিয়র খলিল পালন করে কমান্ডারের ভূমিকা আর গল্পের কথক তার ফলোয়ার। সিদ্ধান্ত হয় তাদের নৌকা যখন নদীর মাঝখানে যাবে তখন গল্পের কথক সিপাহিটিকে গলা টিপে মেরে ফেলবে। ...নৌকা মাঝনদীতে যায়। কিন্তু যোদ্ধাটি কোনোভাবেই আদেশ পালন করতে পারে না। সিপাহিটি এখনও একটি কথাও বলছে না। কোনো প্রতিবাদ করছে না। এমনকি যোদ্ধাটি যখন দড়ি দিয়ে তার পা বেঁধে ফেলে তখনও সে পা দুটো বাড়িয়ে দিয়ে সহযোগিতা করে। যোদ্ধাটি বারবার চেষ্টা করে। কিন্তু ঠান্ডা মাথায় এরকম প্রতিক্রিয়াহীন একটা লোককে গলা টিপে মারা কী করে সম্ভব? খলিলের কাছে একটা গুলি করার পারমিশন চায়। খলিল পারমিশন দিতে নারাজ। কাছাকাছিই রয়েছে পাকিস্তানি ক্যাম্প। মাঝ-নদীর গুলির আওয়াজ সহজেই পৌঁছে যাবে তাদের কানে। গলা টিপেই তাকে মারতে হবে

শুরু হয় ওয়ার সাইকোলজির পরিচিত আর প্রাচীন মানবিক সংকট। যে যাকে হত্যা করে সে তাকে চেনে না। যার হাতে যে নিহত হয় সেও তাকে চেনে না। কারো সাথে কারো কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। যাদের সাথে শত্রুতা তারা বহু দূরে। যে মরবে অথবা যে মারবে দুজনই এসেছে হয় ভাতের টানে না হয় স্বপ্নের ডাকে। শত্রুপক্ষের লোক হওয়া ছাড়া দুজনের সাথে দুজনের কোনো শত্রুতা নেই

যোদ্ধা দুজন এই সংকটে পড়ে যায়। তারা রেগুলার মিলিটারি থেকে আসা মুক্তি ফৌজ নয়। তারা মুক্তিযোদ্ধা। আবেগ আর স্বপ্ন থেকে এসেছে যুদ্ধে। তারা যখন বন্দুক তাক করে তখন সমগ্র পাকিস্তানের দিকেই করে। তাতে পাকিস্তানি মরে হয়ত কম। কিন্তু তারা বিশ্বাস করে সবগুলো গুলিই গিয়ে পড়ে খোদ পাকিস্তানে স্বয়ং ইয়াহিয়ার বুকে। এরকম একজন বন্দীকে মারার জন্য তারা যুদ্ধে আসেনি। কিংবা মানুষকে বন্দী করে মারার কৌশলও জানে না তারা

হাসান আজিজের গল্পটা দুজন মুক্তিযোদ্ধার মানসিক এই সংকট নিয়ে নৌকায় করে ঘুরতে থাকে নদীর বুকে। সিপাহিটাকে অনেক গালাগালি করেও রাগিয়ে গলা টিপে ধরার মতো কোনো রাগ নিজের ভেতরে তৈরি করতে পারে না জুনিয়র যোদ্ধা। বারবার সে একটা গুলি করার পারমিশন চায়। পায় না। নৌকা ঘুরতে থাকে। এক সময় সিনিয়র খলিল তাড়া দেয়। যন্ত্রের মতো উঠে গিয়ে সে হাত-পা বাঁধা সিপাহির গলা টিপে ধরে। এইবার সিপাহিটি যোদ্ধার হাত কামড়ে দেয়। এতে রেগে যাবার একটা কারণ খুঁজে পায় যোদ্ধা। গলা টিপে মেরে ফেলে তাকে। সিপাহিটি যখন মরে গেছে তখন দেখা যায় যোদ্ধার চোখে জল। খলিলের দিকে তাকিয়ে সে শুধু বলে– কেন আমাকে একটা গুলির পারমিশন দিলে না? খলিল নৌকার বৈঠা ছেড়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে। তখন তারও চোখে জল

গল্পটার কাহিনী এইটুকু। ভেতরে সংলাপ যা আছে তা হাতে গোনা দশ থেকে বারোর বেশি নয়। তার উপরে গল্পটাকে নাট্যরূপ দেয়ার ক্ষেত্রে আছে বেশ কিছু মরণ ফাঁদ। প্রথমত এই সিপাহিটির গ্রামে ঢুকে পড়ার রেফারেন্স। বলতে গেলে নেই। একটা জায়গায় সামান্য একটা ইঙ্গিত আছে– উজানে গতরাতে বেশ গোলাগুলি হয়েছে। ...কিন্তু কাদের সাথে কাদের। কারা জিতেছে। কারা হেরেছে। কী ফলাফল। কোনোকিছুই নেই। এই ইঙ্গিতটাকে ভর করে একটা সূচনা কাহিনী দাঁড় করালাম, একদল মুক্তিযোদ্ধা আগের রাতে অতর্কিতে হামলা চালিয়ে একটা ক্যাম্প ধ্বংস করে দিয়েছে। যাবার সময় পুড়িয়ে দিয়ে গেছে সবকিছু। শুধু জঙ্গলে লুকিয়ে বেঁচে গেছে একজন সিপাহি, যে

সকালের আলো ফোটার পর ক্যাম্পের অবস্থা দেখে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে রাইফেল নিয়ে হাঁটতে থাকে উদ্দেশ্যবিহীন। হাঁটতে হাঁটতে এসে ঢুকে পড়ে জনবসতিতে। নিজেকে আবিষ্কার করে গ্রামের মানুষের মাঝে ঘেরাও অবস্থায়

এইবার দ্বিতীয় ঝামেলা। সে কেন হাতে একটা রাইফেল থাকতেও আত্মরক্ষার সুযোগ নিল না। কেন সে কথা বলল না। হাসান আজিজ এর কোনো ব্যাখ্যা দেননি। আবার আমাকে খুঁজতে হলো গেরিলা যুদ্ধের ইতিহাস। একটা চলনসই যুক্তি পেয়ে গেলাম। একজন রেগুলার মিলিটারি হিসেবে সে জানে গেরিলা যুদ্ধে শত্রুপক্ষের হাতে পড়া মানেই মৃত্যু। এসব ক্ষেত্রে প্রিজনার হওয়া কিংবা যুদ্ধবন্দির মর্যাদা পাবার উপায় নেই। দ্বিতীয়ত অত মানুষের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে কী লাভ? অথবা হয়ত দুটো রুটির জন্য সিপাহির চাকরি করতে আসা এই সৈনিকটির গ্রামবাসীদের দেখে কাউকেই শত্রু মনে হয়নি। হয়ত সে ভেবেছে এদের বিরুদ্ধে কেন অস্ত্র তুলতে হবে?

এই পর্যন্ত না হয় নাটকের শরীরের জন্য একটা কাহিনীসূত্র কিংবা যুক্তি দাঁড় করানো গেলো। কিন্তু সবচে বিপদের জায়গাটা হলো নৌকায়। যেখানে খলিল আর রাজু সিপাহিটিকে নিয়ে গেছে। হাসান আজিজ এই গল্পের কথক যোদ্ধার কোনো নাম দেননি। নাটকে তার নাম দেয়া হয়েছে রাজু। বিপদটা হলো কোনোভাবেই যেন মুক্তিযোদ্ধাদের মনে না হয় খুনি। কোনোভাবেই যেন মুক্তিযুদ্ধের সামান্যতম অংশও প্রশ্নবিদ্ধ না হয়। আর হাসান আজিজ যেভাবে বিষয়টিকে সব প্রশ্নের বাইরে নিয়ে এসেছেন, নাটক দেখে যেন সেসবের কোথাও হাসান আজিজ আবার প্রশ্নবিদ্ধ না হন। আর মানুষ হিসেবে সিপাহিটি মানবিক সমর্থন পেলেও কোনোভাবেই যেন সেই সমর্থন পাকিস্তানের দিকে না যায়। আরেকটি কথা, মুক্তিযুদ্ধ ব্যবসায়ীরা যেন মাথা ঢোকানোর কোনো ফাঁক না পায়। কিন্তু কী করে...

বহুকাল আগে পড়া কোনো এক কিংবদন্তিতে কোনো এক সেনা নায়ক তার কোনো এক সৈনিককে বলেছিলেন– শত্রুপক্ষে ভালোমানুষ– নিরীহ মানুষ কিংবা নিরপরাধ মানুষ বলতে কিছু নেই। শত্রুপক্ষের সবাই সমান শত্রু। কে তোমাকে মারবে না তা ভাবলে যুদ্ধ হয় না। ভাবতে হবে সবাই তোমাকে মারবে। এবং সবাইকেই মারতে হবে তোমার। কিংবদন্তির এই থিওরিটি আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায়ও অবিকলভাবে বহাল। কিন্তু কথাটা নাটকে আসবে কী করে? কে বলবে? ...পেয়ে গেলাম আরেকটা চরিত্র। মহাভারতে। কৃষ্ণ। যে অর্জুনকে দিয়ে নিজের আত্মীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাতে গিয়ে ভগবৎ গীতার মতো সর্বকালের সর্ব আধুনিক একটা যুদ্ধ-মনস্তত্ত্বের বই তৈরি করে ফেলেছে। এই গল্পে খলিলের ভূমিকাও অনেকটা কৃষ্ণের মতো। একই সাথে কমান্ডার আর ড্রাইভার। খলিলের মুখে রাজুর জন্য একটা সংলাপ পেয়ে গেলাম– তুই যদি ওর হাতে ধরা পড়তি তাহলে সে অতকিছু ভাবতো না তোকে নিয়ে। এটা যুদ্ধ রাজু। শত্রুপক্ষের সবাই-ই আমাদের কাছে সমান শত্রু
সংলাপটা পেয়ে যাবার পর মনে হলো মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের জায়গা বেশ বন্ধ করা গেলো। নাটকও মুক্ত হলো অনর্থক বক্তৃতা থেকে। যুদ্ধের কঠিন শৃঙ্খলা অনুযায়ী দাঁড়িয়ে গেলো খলিল আর রাজু দুটো চরিত্র। বন্ধুত্ব যতই থাক। কাজের সময় একজন কমান্ডার আরেকজন ফলোয়ার। পাশাপাশি গেরিলা যুদ্ধের অনিবার্য বৈশিষ্ট্য আর মুক্তিযোদ্ধাদের মানবিক গভীরতা

হাসান আজিজের গল্পে সিপাহিটি ধরা পড়ে সন্ধ্যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে যায় পরের দিন সকালে আর নৌকার ঘটনাটি দিনের বেলা। ...আমি তাকে ধরা পড়ালাম সকালে। মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে দিলাম সন্ধ্যায় আর হত্যার জন্য নৌকায় নিয়ে এলাম রাতে। রাজুর দোটানা চলতে থাকল সারারাত ধরে। খলিল নিশ্চুপ। কিন্তু সেও সমানভাবে উপলব্ধি করছে বিষয়টা। সামান্য কয়েক মিনিটের একটা কাজের জন্য সে নদীর বুকে সারা রাত নৌকা চালিয়েছে। মাঝেমাঝে হালকাভাবে রাজুকে মনে করিয়ে দিয়েছে কাজটা সেরে ফেলতে হবে। কমান্ডার হয়েও বন্ধু। মানবিক মানুষ। ডিউটি করতে এসে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা রাজুর সংকট তারও সংকট। রাজুকে মানসিক প্রস্তুতির সময় দিয়ে বৈঠা ছেড়ে খলিল নিশ্চুপ বসে থেকেছে অনেকক্ষণ। স্রোতের টানে নৌকা একা একাই ভেসেছে মাঝ নদীতে। খলিল বলেনি কিছু। শুধু তীক্ষ্নভাবে নজর রেখেছে রাজু না হঠাৎ গুলি করে বসে। যখন ভোর হয়ে আসে তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজুকে মনে করিয়ে দিয়েছে– আমাদের ফিরতে হবে। আর সারা রাত পার করে ভোরের আলোয়

কাজটা শেষ করে যখন প্রচণ্ড চিৎকার করে রাজু গালাগাল করছে খলিলকে, তখন খলিলের চোখে পানি। রাজুর জন্য নয়। যুদ্ধের অনিবার্য সত্যের জন্য

সন্ধ্যায় যখন সুমনের হাতে ড্রাফট স্ক্রিপ্টটা ধরিয়ে দিলাম দেখলাম সুমন বেশ অবাক। সেও আশা করেনি এটা। বললাম পড়ে দেখো। কোথাও কোনো অ্যাডজাস্টমেন্টের দরকার আছে কি না। কিন্তু সে আমাকে আরো বেশি অবাক করে দিলো একটা ইনফরমেশন দিয়ে। মনে হলো সে আগে থেকেই ধরে নিয়েছে স্ক্রিপ্টটা আমি করছি এবং খুব দ্রুতই করব। বলল শুটিংয়ের ডেট ঠিক হয়ে গেছে। ষোলো থেকে বিশ

মাঝরাতেই সুমন ফোন করল– আচ্ছা বানাচ্ছিতো। যদি এইটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন আসে?
– এলে আসবে। আমি যা লিখেছি তার প্রতিটা অক্ষরের জন্য যে কারো মুখোমুখি হতে আমি রেডি। এখানে যা লিখেছি তার প্রতিটি বিষয়ই আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি
– দেইখেন ওস্তাদ। পরে কোনো ঝামেলা হইলে সামলাইয়েন

সুমনের গলায় ভয়। যে ভয়টা আমি পেয়েছিলাম স্ক্রিপ্ট করার আগে। সুমন সেটা পাচ্ছে স্ক্রিপ্ট পাবার পরে। ...পরের দিন সুমন একটা দুর্দান্ত প্রশ্ন করল– আচ্ছা একটাও গুলির শব্দ না শুনিয়ে কি মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলা যায় না?
– যায়। অবশ্যই যায়। হাসান আজিজুল হকও একটাও গুলির শব্দ শোনাননি পুরো গল্পে। আমি সেখানে গোলাগুলি ঢুকিয়েছি নাটকের গ্রাউন্ড তৈরির জন্য
– আমি আমার পুরো নাটকে একটাও গুলির শব্দ শোনাতে চাই না। এক ফোঁটাও রক্ত দেখাতে চাই না। ...সুমন তার কথাকে আরো টেনে নিয়ে গেলো– শুরুটা আরেকটু ভাবেন

বাদ। সমস্ত গুলির শব্দ বাদ। একটা ধ্বংস হয়ে যাওয়া ক্যাম্পের ভেতর থেকে ভোর রাতে উঠে আসছে এক বিহ্বল পাকিস্তানি সৈনিক। নাটকের শুরুতে তাই দেখবে মানুষ। ...হলো। তাই হলো। এবং শুটিংয়ের আগের দিন পর্যন্ত একটু একটু করে ঘষামাজা হতে থাকল পুরো নাটকটা। প্রতিদিন আরেকটু ভালো করার জন্য আরেকটু ঘষামাজা। ...নেশায় পড়ে গেছি। ঘষামাজা নিয়ে সুমন আর আমার মধ্যে তেমন একটা কথাবার্তা হয় না। একজন যা বলে প্রায় ক্ষেত্রেই তা অন্যজনের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। ...কিন্তু সুমন কেমন যেন ঝিমায়। কেমন করে যেন তাকায়– আমরা যা করছি তার ব্যাখ্যা কি সঠিকভাবে দিতে পারব?
– কেন নয়?
– পাবলিক যদি অন্য রকম কিছু ভাবে?
– আই ডোন্ট বদার। আমার কোনো কনফিউশন নেই

তারপরেও আরেকবার চেক করি। আরেকটু পরিষ্কার করা। ...নাটকটি যখন প্রথম লেখি তখন এই এক ঘণ্টার নাটকটিতে ছিল মাত্র আটটি সংলাপ। অনিবার্য জায়গা ছাড়া সংলাপ আমি চাইছিলাম না। এ নাটক শোনার নয়। উপলব্ধি করার। মানুষকে উপলব্ধি করাতে চাই আমি। ...কিন্তু মাথা মোটারা ভেতরের চেয়ে উপরে হাতড়ায় বেশি। তাই আরো পরিষ্কার। আরো একটু। শেষ পর্যন্ত সংলাপের সংখ্যা দাঁড়াল প্রায় বিশের কাছাকাছি
– কিন্তু হাসান আজিজের পারমিশন?
সুমনের নেবার কথা ছিল। মনে করিয়ে দিলাম। সে নির্বিকারভাবে বলল– জিনিসটা আপনিই নিয়া নেন না। আপনি ভালো কইরা বুঝাইয়া কইতে পারবেন

এটাও সুমনের আরেকটা টেকনিক। সে জানে স্ক্রিপ্ট তৈরি হয়ে গেলে হাসান আজিজের পারমিশনের অভাবে স্ক্রিপ্টটা আটকে যাক এটা আমি চাইব না
– আপনার কি মনে হয় উনি কোনো ঘাপলা করব?
– মনে হয় না। তবে স্ক্রিপ্ট দেখতে চাইতে পারেন

– তাহলে?
– দেখাব। আমি কোথাও তাকে ছোট করিনি। তার গল্পও মার খায়নি। দেখাব তাকে
– পারমিশন না নিলে কী হয়?
– বেয়াদবি হয়ে যাবে ব্যাপারটা
– যদি না দেন?
– আমার ধারণা দেবেন। আর না দিলে তাকে বলে আসব গল্পটা তার লেখা হলেও আমাদের কালচারাল হেরিটেজ। এর উপরে আমাদেরও রাইট আছে। ...তবে এক কাজ করা যেতে পারে। গল্পটা নাট্যরূপ দেয়া হয়ে গেছে কথাটা তাকে প্রথমেই না বলি। লেখক মানুষ ক্ষেপে যেতে পারেন। তাকে বরং বলি যে গল্পটা নাট্যরূপ দিতে চাই। তারপর দুয়েকদিন পরে বলব– একটা ড্রাফট দাঁড় করিয়েছি। ফাইনাল হলে পাঠাব
– পাঠাবেন?
– নাটক বানানোর পর সিডি দেবো তাকে

টেলিফোনে হাসান আজিজ সরাসরি অবাক হলেন– এখন পর্যন্ত এই গল্পটা নিয়ে কেউ কোনো আলোচনা করেনি। তুমিই প্রথম বললে। আচ্ছা তোমরা হঠাৎ করে এই গল্পটা নিয়ে কেন ইন্টারেস্টেড হলে বলোতো?
– স্যার পঁয়ত্রিশ বছর গুলি খাওয়া আর গুলি করা নিয়েইতো মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনলাম আর বললাম। ভেতরের কিছু নিয়ে কি বলা দরকার না?
– কিন্তু কীভাবে কী করবে বলোতো?
– দেখি স্যার। নাও যদি পারি তবে ধরে নেব আমাদের একটা এক্সারসাইজ
– খারাপ বলোনি। কিন্তু এটা কি কেউ করবে বলে তোমার মনে হয়?
– করবে স্যার
– বলো কী? বাংলাদেশের মানুষ অত এগিয়ে গেছে? জানি না তো?
– এগিয়ে না গেলেও দুয়েকজনতো এগোনোর চিন্তা করে
– তা ঠিক। কিন্তু কোনো চ্যানেল এটা চালাবে বলে কি তোমার মনে হয়?
– অতদূর পর্যন্ত এখনও ভাবছি না স্যার। আমাদের যতটুকু করার ততটুকু আগে করি
– তা করা যেতে পারে। ঠিক আছে করার পরে আমাকে পাঠিও, আমি দেখে দেবো

হাসান আজিজ নিজেও কি এই গল্পটা নিয়ে কোথাও আলাপ করেছেন? আমার মনে পড়ে না। কিন্তু গল্পটাকে আগাগোড়া ধারণ করে আছেন তিনি। বলার সাথে সাথে গল্পটির খুঁটিনাটি বলতে শুরু করলেন তিনি। নাট্যরূপ দিতে গেলে কোথায় কোথায় সমস্যা হতে পারে। কোথায় কোথায় ভুল ব্যাখ্যার জায়গা থেকে যেতে পারে। সব। আর এই ফাঁকে আমি গল্পটাকে যেভাবে রূপান্তর করেছি সেগুলোকে রূপান্তর করার চিন্তা বলে আস্তে আস্তে যাচাই করতে থাকলাম। কিছু কিছু চিন্তার ব্যাখ্যা চাইলেন। কিছু কিছু চিন্তা সমর্থন করলেন একবাক্যে। আর কিছু কিছু বিষয় সম্পর্কে বললেন– এটাকে তুমি নাটকে দেখাবে কী করে? আমিও যেভাবে দেখিয়েছি সেটাকে দেখানোর চিন্তা বলে তার কাছে ব্যাখ্যা করলাম

হাসান আজিজ বিস্মিত এবং বিস্মিত– আচ্ছা তুমি কি মনে করো এসব বিষয় বলার মতো সময় এসেছে?
প্রশ্নটা তিনি করলেন একটা শিশুর মতো
– আপনিতো স্যার অলরেডি বলে ফেলেছেন। আমরা সেই বলাটাকে এখন রিপিট করছি মাত্র

অনেক কথা। শত্রুর সূত্র ধরেই। কথার শেষ পর্যায়ে এসে আচমকা প্রশ্ন করে বসলেন– আচ্ছা দেশের অবস্থা সম্পর্কে তোমার কী মনে হয়?
প্রশ্নটা হাসান আজিজের। আমি চুপ করে গেলাম। আসোলেই আমার কী মনে হয়? আমার মুখ থেকে বের হয়ে এল– স্যার অনুমান করতে পারি না। ঝাপসা লাগে

এইবার তিনি চুপ করে থাকলেন বেশ অনেকক্ষণ। হয়ত টেলিফোনের ওপাশে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন– তোমরাতো সেদিনের ছেলেপেলে। আমরা এই দেশটাকে গোড়া থেকেই দেখছি। ...জানো আমার মনে হয় মাঝেমাঝে আমিও অনুমান করতে পারি না

লেখার অনুমতি নয়। মনে হলো হাসান আজিজুল হক আমার স্ক্রিপ্ট পড়ে অ্যাপ্রুভাল দিয়ে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে আরেকটা বিষয় বারবার মনে হতে লাগল, বাংলাদেশটা এমন কোন জায়গায় গেছে যে হাসান আজিও আর অনুমান করতে পারেন না?

সুমনকে বললাম– ডান। সুমন অ্যাকসাইটেড। কিন্তু আবার ঝিমিয়ে গেলো– আচ্ছা পারবতো? কী যে হবে বুঝতে পারতাছি না। বললাম– তাহলে বাদ দিতে হবে
– বাদতো দিবই না। কিন্তু...
– কিন্তুর কোনো জায়গা কি আর আছে?

শুটিংয়ের দিন যত কাছে আসতে থাকল সুমনের প্রিপারেশনের সাথে সাথে হাইটও কমে যেতে শুরু করল। সুমন ছ ফুটের বেশি কিংবা কাছাকাছি। সাধারণত হাঁটার সময় নিজেকে উন্দা করে সাড়ে পাঁচ ফুট বানিয়ে হাঁটে। কিন্তু যখন মাথার ভেতরে ঝামেলা থাকে তখন তার হাইট আরও কমতে থাকে। একদিন কলাবাগানে দেখলাম তার হাইট কমতে কমতে তিন ফুটের কাছাকাছি নেমে এসেছে। দেখলাম কিন্তু বললাম না কিছু। আমাদের এখানে যারা আসে তাদের মধ্যে একটা অলিখিত বোঝাপড়া আছে। কেউ যদি একা একা ঝিমাতে চায় তাহলে তাকে ঝিমানোর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া। কেউ যদি তার ভেতরের ঝামেলাগুলোকে এনজয় করতে চায় তাহলে তাকে ডিস্টার্ব করে না কেউ

সুমন কথা বলছে না কারো সাথে। হাঁটছে। ঘুরছে। চা-বিড়ি ফুঁকছে। একটা ফোন আসল। সবার থেকে দূরে গিয়ে অনেকক্ষণ কথা বলল নিচু স্বরে। ওরকম প্রায় সবারই প্রায়ই হয়। দূরে গিয়ে একা একা কথা বলার ফোন কলাবাগানে প্রত্যেকেরই আসে বেশ অনেকবার। কিন্তু সুমন দূরে বসে কথা বলতে বলতে এক সময় এগিয়ে এল আমাদের দিকে। আমার দিকে ফোনটা বাড়িয়ে দিতে দিতে বলল– নেন রাইটারের সঙ্গে কথা বলেন
– কে?
– ফজলুর রহমান বাবু
সুমনের শত্রু নাটকের খলিল চরিত্রটি তার করার কথা। শিডিউলও নেয়া হয়ে গেছে। ভদ্রলোকের সাথে আমার পরিচয় নেই। ফরমালিটি শেষ করে তিনি আমার বয়স জানতে চাইলেন। বললাম
– তখনতো আপনার জন্মই হয়নি
– আমার জন্ম কখন হয়নি আর কখন হতে পারত তা নিয়ে কথা বলার কী আছে? প্রব্লেমটা কী?
– যুদ্ধের কথা আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে
– হ্যাঁ। তারপর?
– আপনি কি মনে করেন যে এখন এই নাটক করার মতো সময় এসেছে?
– হোয়াই নট?
– এই নাটকের সিম্পেথি পাকিস্তানিদের দিকে চলে যাবে
– আমি যেভাবে স্ক্রিপ্ট করেছি তার ফিফটি পার্সেন্টও যদি ডিরেকশন আর পারফর্মেন্সে আসে তা হলে যাবে না। আমি কনফার্ম
– অত কনফার্ম আপনি হন কীভাবে?
– তার ব্যাখ্যাতো ফোনে দেয়া যাবে না। তবে একটা বিষয় বলতে পারি– সময় আসেনি। সময় হয়নি করেতো থারটি ফাইভ ইয়ার্স গন। আর কত? পঁয়ত্রিশশো বছর পরে বলবেন?
– কিন্তু এই মুহূর্তে এটা করলে এর বেনিফিট চলে যাবে ওদের হাতে

– ওদের হাতে বেনিফিট চলে যাবার ভয়ে আজীবন মুক্তিযোদ্ধাদের শুধু গুলি মারা আর গুলি খাওয়া লোকই দেখাবেন? ওরাও যে মানুষ ছিল তা বলা যাবে না?
– তা বলেন। কিন্তু এই নাটকে যেভাবে দেখিয়েছেন তাতে কি ব্যাখ্যা দেবার কোনো সুযোগ থাকবে?
– আমি আমার প্রতিটি অক্ষরের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত। যেকোনো সময়। যেকোনো জায়গায়
– সাহসটা কি একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না?
– সাহসের অভাব ছিল বলেই পলিটিক্স ছেড়ে এসে এনজিও করি। বাট আর কত?
– আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এখন এই নাটকটা করা উচিত না
– আমি তা মনে করি না। মুক্তিযুদ্ধের সাইকোলজিক্যাল গ্রাউন্ড নিয়ে কাজ করার এখনই সময়। ফিজিক্যাল আর পলিটিক্যাল গ্রাউন্ড নিয়ে অসংখ্য কাজ হয়েছে
– আপনার সব কথার সাথে আমি একমত। শুধু সময়ের ব্যাপারটা ছাড়া
– সেই ফ্রিডম আপনার আছে
– ঠিক আছে ভাই আপনারা করেন। দেখেন কতটুকু করতে পারেন। আমরাও দেখি। তখন না হয় আমরাও একটু সাহস পাব... ভালো থাকবেন... সুমনকে দেন

সুমনের হাতে ফোন দেবার পর সুমন বেশি হলে দশ সেকেন্ড কানে লাগিয়ে শুনল। তারপর– ঠিক আছে বলে রেখে দিলো ফোন– ফজলুর রহমান বাবু করবে না

স্ক্রিপ্ট হাতে পাবার আগেই সুমন সবগুলো কাস্টিং ফাইনাল করেছে। যতটুকু জানি গল্প শুনে ফজলুর রহমান বাবুও অ্যাকসাইটিং ছিলেন। কিন্তু যখন স্ক্রিপ্টটা হাতে পেলেন... হাসান আজিজের শিশুর মতো করা প্রশ্নটি আমার মনে পড়ে গেলো। ভদ্রলোকের প্রশ্নটাও একই জায়গায়। ...তার সাথে কথা বলার সময় আমার মেজাজ বেশ বিগড়ে গিয়েছিল। টোনটা কোনোভাবেই কুল ছিল না। আমি বোধহয় আরণ্যকের এক সিরিয়াস নাট্যকর্মীর মুখে এরকম কনফিউশন এক্সপেক্ট করছিলাম না। তিনি গ্রুপ থিয়েটার কর্মী। ...অন্যকিছু... অন্যকিছু। বোধ হয় অনেক বেশি কিছু আশা করছিলাম। তার জায়গায় মিডিয়ার চামড়া ব্যবসায়ী লিকুইড কারেকটারের অন্য কেউ হলে এ প্রসঙ্গে কোনো কথাই বলতাম না। সোজা বলে দিতাম– পছন্দ না হলে ডিরেক্টরকে জানিয়ে দিন করবেন না। এ নিয়ে কথা বলার কী আছে? ...কিন্তু আমি বোধ হয় ফজলুর রহমান বাবুকে কনভিন্স করারও চেষ্টা করেছি। ...আসোলে আমাদের এক্সপেক্ট করার জায়গা খুব কম, আবারও রিয়েলাইজ করলাম। এজন্য যাদের কাছে এক্সপেক্ট করি মাঝেমাঝে তাদের উপর অবিচারও করে ফেলি। নো প্রব্লেম। ...সুমন যদি নাটকটা নাও করে আমি নিজেই করব কোনো একদিন

সুমন যখন প্রথম তার কাস্টিং প্লানিংয়ের কথা বলে তখন খলিল চরিত্রে ফজলুর রহমান বাবুর ব্যাপারে আমার কিছু আপত্তি ছিল। কারণ তার বয়স। আমি দুজন মুক্তিযোদ্ধাকে আরো তরুণ দেখেছি। বিশ-বাইশের কোঠায়। সুমনকে বলেছিও। শত্রু নাটকে যে ধরনের ঘটনা তাতে পূর্ণ বয়স্ক মানুষের ইমোশনাল ইনভলভমেন্ট ততটা লজিক্যাল নয় যতটা তরুণদের ব্যাপারে যুক্তিসংগত। কারণ মানুষের যত বয়স বাড়ে মানুষ তত লজিক্যাল হয়ে যায় আর ইমোশন কমতে থাকে। আর মানুষ যখনই একটু একটু করে লজিক্যাল হতে থাকে তখন অনেকেই হয়ে উঠে ক্রিমিনাল। যার প্রমাণ সারা পৃথিবীর কোনো ক্রিমিনালই তরুণ ছিল না। হয় ছিল মধ্যবয়স্ক না হয় বৃদ্ধ। একজন তরুণের পক্ষে খুনি হওয়া সম্ভব। কিন্তু কোনোভাবেই ক্রিমিনাল নয়। এই নাটকের দুই যোদ্ধা যদি তরুণ না হয়ে মধ্যবয়স্ক হতো তাহলে অত কিছু ভাবতও না। সময়ও নষ্ট করত না। চোখ বন্ধ করে কাজ শেষ করে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে ফিরত নিজেদের ক্যাম্পে। কিন্তু যোদ্ধা দুজন তরুণ। এজন্যই এই ঘটনা। এজন্যই হাসান আজিজ গল্পটি লিখেছেন। এজন্যই আমি তার রূপান্তর করেছি নাটকে আর সুমন চেষ্টা করছে বানানোর

আমি সুমনকে বলছিলাম আরো ইয়াং কাউকে নিতে। কারণ রাজুর জন্য সে কাস্ট করেছে আরণ্যকেরই জয়রাজকে। জয়রাজের কাছাকাছি বয়সের ম্যাচিং কারো কথা বলছিলাম আমি। বাবুর সাথে জয়রাজের বয়সের যা ডিফরেন্স তাতে

হয়ত একসাথে যুদ্ধ করা যায়। কিন্তু ইমোশন শেয়ার করা যায় না। কিন্তু নাটকটা শেষ পর্যন্ত ডিরেক্টর্স মিডিয়া। আর সুমন বেসিক্যালি ঘাউড়া। তার উপরে সুমনের ক্ষেত্রে প্রবাদের মতো একটা ব্যাপার দাঁড়িয়ে গেছে যে তার প্রতি নাটকেই কমপক্ষে একটা হলেও মেজর মিসকাস্ট থাকবে। প্রতি নাটকেই থাকে একটা দুইটা। আগে বললে সুমন শোনে না। পরে নাটক দেখে আর গালি দেয়– খানকির পোলা ডুবাইছে আমারে। ...আমি আর এ বিষয়ে কথা বলিনি। ও করুক তার মতো করে

তখনই বোধহয় সুমন ফোনে খলিলের জন্য কাস্টিং ঠিক করে ফেলে। আমার মুখ থেকে বের হয়ে আসে– পারফেক্ট। এইবার ঠিক আছে। পরের দিন হাসান আজিজুল হককে ফোন করে বলি– স্যার একটা ড্রাফট দাঁড় করিয়েছি। ফ্রেশ করিনি। কাস্টিংও হয়ে গেছে। মজার ব্যাপার হলো এই নাটকে খলিল চরিত্রটা করছে আপনার 'মন তার শঙ্খিনী' গল্পের নাট্যকার এবং ডিরেক্টর আমিনুর রহমান মুকুল। আমি আগে এবং আজকেও বলতে ভুলে যাই যে 'মন তার শঙ্খিনী' নাটকের মূল চরিত্র যে করেছিল সে হচ্ছে এই নাটকের ডিরেক্টর

হাসান আজিজুল হকের গল্প 'মন তার শঙ্খিনী' নাটকটি করেছিল থিয়েটার সেন্টার। নিরানব্বইর দিকে। আমিনুর রহমান মুকুল তখন চিটাগাং ভার্সিটির ড্রামাটিক্স থেকে পাশ করে ঢাকায় এসেছে। থিয়েটার সেন্টারে সে নাটকটি ডিরেকশন দিয়েছিল গেস্ট ডিরেক্টর হিসেবে। নাট্যরূপও তার। আর সে নাটকের মূল চরিত্র সাদু করেছিল সুমন

বাংলাদেশের তিনটি ইউনিভারসিটির ড্রামা ডিপার্টমেন্ট থেকে যারা পাশ করে বেরিয়েছে তাদের সবার থেকে মুকুল আলাদা। বাংলাদেশের মঞ্চ নাটকে ড্রামা ডিপার্টমেন্টেগুলোর কনট্রিবিউশন এখনও প্রায় জিরো পর্যায়ে। এরা প্রায় কেউই সুবিধা করতে পারেনি পাশ করে বেরিয়ে। না পেরেছে প্রোফেশনাল থিয়েটার করতে। না পেরেছে অ্যাডজাস্ট করতে গ্রুপ থিয়েটারের সাথে। মুকুল কমপারেটিভলি ব্যতিক্রম। এর কারণ হয়ত এটা যে বাকিদের বেশিরভাগই ভার্সিটির ড্রামাতে ভর্তি হয়েছে স্রেফ একটা ইউনিভারসিটি ডিসিপ্লিনে পড়ার জন্য। অন্য কোথাও সিট না পেয়ে। ভর্তির আগে বেশিরভাগেরই কোনো গ্রুপের সাথে যোগাযোগ ছিল না বললেই হয়। মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন আছে ব্যতিক্রম। আর যাদের গ্রুপের সাথে ইনভলভমেন্ট ছিল তারাও ভার্সিটিতে ভর্তির পর বেশিরভাগই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে গ্রুপ একটিভিটি থেকে। কিন্তু মুকুল ছিল চিটাগাং সমীকরণ-এর নিয়মিত কর্মী। ড্রামাতে ভর্তির আগে– ড্রামাতে পড়ার সময় এবং ড্রামা থেকে পাশ করে বেরোনোর পরও। এই কারণেই বোধহয় একমাত্র সেই তার অ্যাকাডেমিক কোচিংকে পরবর্তীতে গ্রুপ থিয়েটারের সাথে অ্যাডজাস্ট করতে পেরেছে। এখন সে ঢাকায় নিজে পালাকার নামে একটা গ্রুপ থিয়েটার তৈরি চালায়। ...মুকুলের কথা শুনে তিনি বললেন– ছেলেটা সিরিয়াস

নাটকটা হয়ে গেলো। শুটিং শুরু এবং শেষ হয়ে গেলো। আমাকে টিমের মেম্বাররা গালাগালি করল কঠিন কিছু দৃশ্য লেখার জন্য। বিশেষত টিটু। ফারুক খান টিটু। প্রধান সহকারী পরিচালক এবং কলাবাগান আড্ডার আরেকজন ফাউন্ডার অ্যান্ড রেগুলার মেম্বার। কারণ দৃশ্যগুলো অ্যারেঞ্জ করতে গিয়ে লাল সুতা তারই বের হবে

আমার লেখা প্রথম নাটক শুটিং হলো। এটাই প্রথম হবার কথা ছিল না। অন্যগুলো নিয়ে প্রিপারেশন নিচ্ছিলাম। কিন্তু ঝড়ের বেগে এই শত্রু গল্পটি ঢুকে বাকি সব ভাসিয়ে নিয়ে গেলো। ...শুটিংয়ের সেটে আমার যাবার কথা ছিল। যাইনি। আমার নিজের জন্য নিজের কিছু সিদ্ধান্ত আছে। ...শুটিংয়ের সেটটা মূলত ডিরেক্টরের। সেটে লেখক গেলে শুরু হয় দোটানা। তাই একবার যদি কাউকে ট্রাস্ট করে স্ক্রিপ্ট দেয়া হয় তবে নাটক তৈরি হওয়া পর্যন্ত তার উপর ট্রাস্ট করা উচিত। সে তার মতো করে বানাবে। তারপর যদি কোথাও মনে হয় ডুবিয়ে দিয়েছে তাহলেতো বাংলা চ বর্গের গালিগুলো থাকলই তার জন্য। অথবা ভদ্রভাবে বললে বলতে হয়– গুডবাই। এই স্ক্রিপ্টটাই প্রথম এবং এটাই শেষ। যার কারণে আমি যাইনি। শুধু অন্যদের মুখে শুটিংয়ের ভয়াবহ বর্ণনা শুনেছি। যা আয়োজন তা বাংলাদেশের সিনেমায় করে। এক ঘণ্টার নাটকের জন্য করে না কেউ। আর খাটনির বিষয়টি বোঝানোর জন্য একটা ইনফরমেশনই যথেষ্ট, ছয়দিন শুটিংয়ে সুমন একবারও পায়খানা করেনি। একসাথে শুটিং শেষ করে বাড়িতে এসে ঢুকেছে টয়লেটে...

হয়ে গেলো। এবং হয়ে গেলো। সমালোচনা সুমন যা পেলো তার নিরানব্বই ভাগই আমার কাছ থেকে। আচাছা বাংলায়। সরাসরি। এটাও আমাদের কলাবাগান আড্ডাবাজদের আরেকটা প্র্যাকটিস। আমরা যখন নিজেদের কারো সমালোচনা কিংবা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করি তখন ভদ্রতা এবং সেন্সর না করেই করি। যদিও এজন্য একদিন মিলন আমাকে বটি দিয়ে কাটতে গিয়েছিল আমারই বাসায়। কলাবাগান আড্ডার কিছুদিনের এক মেম্বার দিলীপ চক্রবর্তী এই আসরে ক্ষেপে গিয়ে দেশ নাটকে আমার নামে এমন অভিযোগ করল যে দলের প্রধান শামসুল আলম বকুল ষোলো বছরের পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা ভুলে, একবারের জন্যও কিছু জিজ্ঞেস না করেই গ্রুপের সেক্রেটারিকে দিয়ে ফোন করিয়ে আচার আচরণ খারাপ অভিযোগ এনে আমাকে দেশ নাটক থেকে বহিষ্কার করে দিলেন। আবার এই কলাবাগান আড্ডারুদের কারণেই বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করলেন কিছুদিন পর। কিন্তু তার পরেও আমার বাসার আড্ডা এবং ধোলাই সেশন এখনও চলে সমান তালে। সবাই সবাইকে বলে। যার যা ইচ্ছা

সুমনকে যা বলেছি তার দুটো কারণ। প্রথমত আরেকটু ভালোর লোভ। দ্বিতীয়ত সেই এক্সপেক্টেশন। কিন্তু তারপরেও যা হলো নিজেকে বললাম– ইউনিক

...এবং স্বপ্ন দৌড়াতে থাকল আরো। তখন ঢাকায় একটা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভাল হচ্ছে। সো...? ...ঢাকা ফিল্ম ফেস্টিভাল আমরা মিস করলাম। ফিল্ম জমা দেবার মেয়াদ পার হয়ে গেছে। সামনে লন্ডন ফিল্ম ফেস্টিভাল। ...ইংলিশ সাব-টাইটেল। করতে হবে। আবারো সেই স্ক্রিপ্ট পর্যায়ের কাজ। করলাম। সরকারি কলেজের ইংরেজি মাস্টার– দেশ নাটকের কর্মী– কলাবাগানের আড্ডারু আর গল্পকার অনন্ত মাহফুজ এসে কেটেছেঁটে ঠিক করে দিয়ে গেলো ইংলিশ সাব-টাইটেল। তখন নিজের মনে হচ্ছে– ইয়েস। ...আমরা মানসিকভাবে প্রস্তুত শত্রু উৎসবে যাচ্ছে। আর একটি চ্যানেলে যাচ্ছে ষোলো ডিসেম্বর। বিজয় দিবসে। সেই অনুযায়ীই পরিকল্পনা এবং আলাপ হয়েছে চ্যানেলের সাথে...

ঘষামাজা করতে করতে দেরি হয়ে গেলো। একটু একটু করে আরেকটু ভালোর চেষ্টা। ষোলোই ডিসেম্বরের জন্য জমা দেবার সময় পার হয়ে গেলো। সো হোয়াট? সামনে ছাব্বিশে মার্চ। ...আরেকটু সময় পাওয়া গেলো। ...সাব-টাইটেল লেখা হলেও করা হলো না। যখন সুমন ফ্রি তখন এডিটর ব্যস্ত...

একটা প্রিমিয়ার শো করার ব্যাপারে সুমনের আগ্রহই সবচেয়ে বেশি ছিল। কিন্তু সুমন ঝিমুতে থাকল– যদি কেউ কিছু ঝামেলা পাকায়?
– মানে?
– যদি বিষয়টা নিয়ে প্যাঁচায়?
– প্যাঁচালে প্যাঁচাবে
– সামলাইয়েন আপনে
– আমি যা করেছি তার ব্যাপারে আমার কোনো দ্বিধা নেই

সুমন প্রিমিয়ার শো করল না। যে নাটক নিয়ে সে আশাবাদী ছিল একটা পুরস্কারের। সেটি ফেলে রাখল। ...নাটকটি কোথাও যাচ্ছে না। কোনো চ্যানেলই চালাবে না। যে চ্যানেল আগে বলেছিল চালাবে তারাও পিছিয়ে গেছে। সম্ভব নয়। এই রিস্ক নেয়া যাবে না। এই নাটক চালিয়ে কে নিজের বিপদ ডেকে আনবে? তার চেয়ে শর্ট ফিল্ম হিসেবে চালান...

শর্ট ফিল্ম চালাতে গেলে বাংলাদেশের ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের অনুমতিপত্র লাগে। সেন্সর আইন আর তার সাথে যারা যুক্ত থাকেন এবং তারা যেভাবে কাজ করেন সে ব্যাপারে কিছু বিদ্যা হয়েছে আমার। সেই বিদ্যা থেকে বিষয়টা নিয়ে আর একটাও শব্দ খরচ করার কোনো আগ্রহ হলো না। লন্ডন ফিল্ম ফেস্টিভাল আর মাথায় নেই...

আমার একটা দায় থেকে গেছে। হাসান আজিজুল হক। তাকে নাটকটি দেবার কথা আমার। যখন তাকে বললাম তৈরি হয়ে গেছে। তিনি বললেন– চলে আসো। একসাথে বসে দেখব। ...হচ্ছিল না। এমনকি একটা সিডিও জোগাড় করা হচ্ছিল না। ...আমরা বোধ হয় সবাই... হয়ত হতাশা। হয়তবা অন্য কিছু... মাঝেমাঝে মনে হয় বেয়াদবি হয়ে যাচ্ছে। হাসান আজিজকে একটা সিডি দেয়া দরকার। সুমনকে বলি একটা আপডেট সিডি আমাকে দিতে। সেও বলে দেবে... তারপর আমিও খোঁজ করি না। সেও ভুলে যায়

হাসান আজিজ একটা প্রোগ্রামে ঢাকায় এলেন। বেশ অনেকদিন থেকে জেনেও তার জন্য একটা সিডি করা হলো না আমার। তাকে বললাম– এ মাসের শেষের দিকে রাজশাহী যাব। আমি নিয়ে যাব হাতে করে। আর একসাথে বসে দেখব আপনার বাসায়

রাজশাহী যাবার প্লানটা সত্যি। শাহবাগের আড্ডায় বসে একদিন মনে হলো আমাদের যাওয়া হচ্ছে না কোথাও। ওখানের আড্ডারুরা সবাই লেখক। ...চা খেতে খেতে আকাশ বলল– কালকে। আকাশ মানে কবি ওবায়েদ আকাশ। অনেকেই ছিল। শেষ পর্যন্ত আমি ছাড়া যাবার ব্যাপারে যে আরেকজন রাজি হলো সে কবি খোকন মাহমুদ। কোথাও একটা জায়গায় যাওয়া দরকার। কোথায়? যেকোনো জায়গায়। এই উদ্বাস্তু নগরীর বাইরে যেকোনো জায়গা। ...ওকে কুমিল্লা। ...দুদিন। আমরা তিনজন। ...ওখানে ঘুরতে ঘুরতে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম– প্রতি বিষুদবার রাতে অথবা শুক্রবার সকালে আমরা বেরিয়ে পড়ব। শুক্র শনি দুদিন থাকব একেকটা জায়গায়। যার যার সুবিধা সে যাবে। দুজন হলেই রওয়ানা। সেই হিসেবে এই মাসের শেষে আমাদের রাজশাহী যাবার কথা

হাসান আজিজের বাসায় যেদিন সিডি নিয়ে পৌছালাম সেদিন সারাদিন সেখানে কারেন্ট নেই। একসাথে বসে নাটকটা দেখা হলো না। কথা হলো অনেক। কিন্তু হঠাৎ তিনি জানতে চাইলেন– আচ্ছা ভুল বোঝার মতো কোনো জায়গা নেইতো? দেখো আবার

হাসান আজিজের ভেতরে কি কোনো ভয় কাজ করছে? জানি না। কিন্তু কেমন যেন। অন্যরকম। শত্রু গল্পটা লিখে যখন ছাপান তখন তার ভেতরে কোনো ভয় কাজ করেছিল কি না আমি জানি না। গল্পটা নাটক বানানোর ব্যাপারেও আপত্তি করেননি তিনি। কিন্তু...

শত্রুর দিকে আরেকবার তাকালাম আমি। ফজলুর রহমান বাবু স্ক্রিপ্ট ফিরিয়ে দিয়েছেন। চ্যানেল পিছিয়ে গেছে। সাচ্চু ভাই মেনে নিয়েছেন আর্থিক ক্ষতি। সুমন ভুলতে চাচ্ছে শত্রুর কথা। কিন্তু আমি? ...শত্রু গল্পটা আমার লেখা নয়। পড়িওনি। নাটকের জন্য নির্বাচনও করিনি আমি। কিন্তু যখন নাটকে রূপান্তর করলাম তখন নিজেকে বললাম– গল্পটা হাসান আজিজ লিখেছেন। সুমন বানাবে কিন্তু এর একশোভাগ মালিকানা আমারও। সবার সব অধিকার স্বীকার করেও আমি এর একটা ফোঁটা মালিকানাও ছাড়তে নারাজ। ...আর আজ রাজশাহীতে বসে মনে হলো... যদি সবাই-ই ছেড়ে যায় যাক। এই দৃশ্যগুলো থেকে এক ইঞ্চিও সরবো না আমি। যা লিখেছি তা আমি সমর্থন করি। আমি বিশ্বাস করি আমার প্রতিটি অক্ষর...

রাজশাহী থেকে রাতে আমরা চলে এলাম নাটোর। সারাদিন সেখানে কাটিয়ে পরের রাতে ঢাকায়। হাসান আজিজকে কয়েকবার ফোন করতে যেয়েও করিনি। ...হয়ত রাস্তায় সর্বশেষ হতাশার কথাটি শুনতে চাই না সেজন্য। পরের দিন সকালে ফোন করলাম। তিনি ধরলেন– নাটকটা দেখলাম... অনেকক্ষণ চুপ আমি। কয়েক লক্ষ প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হলো। একটাও করলাম না। তিনিই বললেন– ভালো বানিয়েছে। আর ছেলেগুলো অভিনয়ও করেছে দারুণ। ...আমি নির্মাণ কিংবা অভিনয়ের মূল্যায়ন হাসান আজিজের মুখ থেকে শুনতে চাই না। ...প্রশ্নটি করেই ফেললাম– স্যার আপনার গল্প কি মার খেয়েছে কোথাও?
– নাহ। আমার যে সন্দেহগুলো ছিল তা হয়নি

– আর ভয়?
– কিসের ভয়?
– কোথাও কোনো ভুল ব্যাখ্যার?
– নাহ। আমি বেশ খেয়াল করে দেখলাম তুমি সেই জায়গাগুলো বন্ধ করে দিয়েছ

টেলিফোনটা করার সময় আমার হাত এবং শরীর দুটোই কাঁপছিল। ...আমি সোজা হয়ে বসলাম। তার কাছ থেকে আমার আর কিছু জানার নেই। শুধু তাকে একটা ইনফরমেশন দেবার আছে আমার। ...কিন্তু অনেক কথা হলো। কার কার অভিনয় দুর্দান্ত। কে ঠিকমতো টানতে পারেনি। এই বিশাল কাজ কীভাবে করল। ডিরেক্টরের বয়স কত হতে পারে। সে আর কী কী করে। ফিন্যান্স কে করল। অত টাকা উঠে আসবে কি না। ...বাংলাদেশের রাজনীতি। জঙ্গি হামলা। নেক্সট ইলেকশন। আমার পরবর্তী প্লান। ইয়াংদের লেখালেখি। তার আর কোন কোন গল্পকে আমি নাট্যরূপ দিতে পারি। মঞ্চ নাটকের বর্তমান অবস্থা। এবং শত্রু নাটকের সবাই যেন রাজশাহী এলে তার বাসায় এক কাপ চা খেয়ে যায়। তার আগে তার পক্ষ থেকে যেন সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই, বিশেষ করে দুর্দান্ত কাজের জন্য সুমন আর অসাধারণ অভিনয়ের জন্য মুকুলকে। ...কথা প্রায় শেষ। আমি ইনফরমেশনটা তাকে জানালাম– স্যার এই নাটক কোনো চ্যানেলে চলবে না
– কেন?
– ওরা সাহস করতে পারছে না বিতর্কের ভয়ে

হাসান আজিজ অনেকক্ষণ চুপ করে গেলেন। কিছু কি হতাশ হলেন? গল্পটি লেখার পর হয়ত ভুলেই গিয়েছিলেন এরকম একটা গল্প লিখেছেন তিনি। কেউই কোনো আলোচনা করেনি এই গল্পটি নিয়ে। হয়ত তিনি নিজেও করেননি। তার লেখা নিয়ে প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও আলোচনা হয়। হোক তা মুখে অথবা লিখে। তার গল্প নাটকও হয়। অনেক বিখ্যাতরা করে। তিনিই বলেছেন এই গল্পটি নিয়ে কোনো আলোচনা কিংবা পরিকল্পনার কথা আমার মুখেই শুনেছেন প্রথম। তিনি কি তার অনুমান করতে না পারা বাংলাদেশে আবারও কিছুটা আশাবাদী হয়ে পড়েছিলেন? যার জন্য আমার মতো এক আনাড়িকেও গল্পটি নাট্যরূপ দেবার অনুমতি দিয়েছিলেন তিনি? ...আমি ফোন ধরে আছি। ওপাশ থেকে অন্তত একটা শব্দ না শুনলে ফোন রাখতে পারছি না। ...হালকা একটা দীর্ঘশ্বাস শুনলাম। হাসান আজিজ তার প্রমাণিত বিশালত্ব নিয়ে এক তুচ্ছ তরুণের সামনে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস আর বোল্ডনেস নিয়ে মুখ খুললেন– থাকুক লীলেন। আমাদের নাটক আমরাই দেখব
২০০৬.০৬.১১

ভূমিলক্ষ্মী

পাগলের সাথে সংসার করা যায়। কিন্তু ভূতে-ধরা মানুষের সাথে সংসার করা কঠিন। না হলে সায়বান বিবির স্বামী নয় বিঘা ধানি জমি আর তিন বিঘার বাড়িসহ ঘরজামাইগিরি ছেড়ে তালাকের পথ বেছে নিত না। একমাত্র ছেলে মোস্তফা আর বৌ নিয়ে শ্বশুরের জমি নেড়েচেড়ে তার দিন কোনোভাবেই খারাপ যাচ্ছিল না। তাছাড়া সায়বান বৌ হিসেবে একেবারেই আলাদা। বলতে গেলে বলতে হয় আরামের বৌ। তার কোনো চাহিদা নেই। আব্দার নেই। তার বাপের জমির ফসল থেকে আসা টাকা কিংবা বাড়ির আয়-ইনকাম স্বামী কোথায় খরচ করছে। বিড়ি টানছে কি জুয়া খেলছে সে বিষয়ে তার কোনো মাথা ব্যথাই নেই। বিয়ের অত বছরের মাঝে সায়বান বিবি স্বামী নিজামউদ্দিনকে কোথাও নিয়ে যেতেও বলেনি। নিজামউদ্দিনও বলেনি কোথাও যাবার কথা। কে আর নিজে থেকে ঝামেলায় জড়াতে চায়। বউ নিয়ে বেড়াতে যাবার চেয়ে নিজের মতো করে যাত্রা-টাত্রা দেখে কিংবা মাসে থানা সদরে গিয়ে দুয়েকটা বই দেখে ইয়ার বন্ধুদের সাথে দিন কাটানো ঢের ভালো। বন্ধু বান্ধবরা যখন নিজেদের সংসার আর বৌয়ের ঘ্যানঘ্যানানির কথা বলত তখন নিজামউদ্দিনের বরাবরই নিজেকে ভাগ্যবান মনে হতো। কিন্তু ঝামেলাটা শুরু হলো শ্বশুর মরার পর থেকে। যদিও সে ঘরজামাই। কিন্তু তাকে শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে এক বাড়িতে থাকতে হয়নি কোনোদিনই। শাশুড়ি মরেছে অনেক আগেই। আর মেয়েকে বিয়ে দিয়ে, জামাইকে জায়গাজমি বুঝিয়ে দিয়ে আত্মীয় স্বজনের কাছে বিদায় নিয়ে শ্বশুর রহমত আলী চলে গেছে বর্ডার পার হয়ে তার বাবার ভিটায়। তার শেষ ইচ্ছে ছিল বাপ-দাদার ভিটেতে গিয়ে মরা। তার বাপ মরতে পারেনি বাপের ভিটাতে। তাই একমাত্র ছেলেকে বলেছিল পারলে যেন বাপের ভিটাতে গিয়ে মরে। এটা পরবাস। কোথায় কোন দিল্লিতে বসে কারা একটা আইন বানাল আর সাথে সাথে মানুষকে ভিটে মাটি ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমাতে হলো বৌ-বাচ্চা নিয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্য। রহমত আলীর বাবা এ বিষয়টা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু ছেলে রহমত আলী আর অতি সুন্দরী বৌ চান বানুর কথা চিন্তা করে তাকে ভিটে ছেড়ে চলে আসতে হলো এ পারে। সে নিজের প্রাণের ভয়ের চেয়েও ভয় পেয়েছিল যদি কেউ এই সুযোগে চান বানুর কোনো অসম্মান করে। তাই সে দেশ বিভাগের শুরুতেই চলে এসেছিল। যদিও সে ওটাকে দেশ বিভাগ বলত না। বলত উচ্ছেদের বছর

রহমত আলীর বাবা চলে এলেও তার ছোট ভাই রয়ে গিয়েছিল মাটি কামড়ে। সে তখনও বিয়ে করেনি। তাই উচ্ছেদের সময় দেশও ছাড়েনি। প্রথম কয়েকদিন আশেপাশে পালিয়ে থেকেছিল। পরে আস্তে আস্তে আবার বাড়ি ঘরে গিয়ে বসবাস শুরু করে। রহমত আলীর বাবাও ভেবেছিল সব ঠিকঠাক হলে আবার নিজের দেশে ফিরে যাবে। কত কাল আর থাকা যায় বিদেশ মাটিতে। কিন্তু এক সময় দেখল ফেরাটা কঠিন। এমন ভাবে তারা আইন বানিয়েছে যে এখন নিজের দেশে যেতে হলেও পাসপোর্ট-ভিসা লাগে। তখন এখানে সে ছেলে রহমত আলীর জন্য কিছু জায়গা জমি আর ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করার দিকে মন দিলো। কিন্তু মনে মনে ইচ্ছে রইল বাপের ভিটেতে গিয়ে মরার। কেননা স্থানে মান আর অস্থানে অপমান। এই কথাটা সে জেনে এসেছে পরিবারের ইতিহাস থেকে। কিন্তু হঠাৎ করেই সে বড়ো বেশি কাহিল হয়ে পড়ল। স্বাভাবিক হাঁটাচলা করাও কঠিন হয়ে পড়ল তার। তখন কেউই আর তাকে বনে বনে চোরা পথে বর্ডার পাড়ি দেবার বিষয়ে সায় দিলো না। বলল ভালো হলে যাওয়া যাবে। কিন্তু আর ভালো হলো না রহমত আলীর বাবা। নিজের ভিটেতে যাওয়াও হলো না। যেতে হলো ভিনদেশের কবরে। কিন্তু যাবার আগে ছেলে রহমত আলীকে বলে গেলো যেন শেষ সময়টাতে অন্তত দেশে গিয়ে মরে। ওখানে এখনো তাদের জায়গা সম্পত্তি আছে। ভাইয়ের ছেলেরা ভোগ করছে। তারা ফেলে দেবে না। তাছাড়া একটা কবরের জায়গা ছেড়ে দিতে কারো আপত্তিও থাকার কথা না

বাপ মারা যাবার পর রহমত আলী উঠে পড়ে লাগে মেয়ে বিয়ে দেবার জন্য। অবশ্য তারও আগে সে চেষ্টা করেছে মেয়েকে বোঝাতে যে এই দেশটা আমাদের দেশ না। আমরা উচ্ছেদের বছর এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছি। চল আমরা দেশে যাই। কিন্তু মেয়ে সায়বান রাজি হয়নি। সে বলত নিজের দেশ হলে তা তোমার নিজের দেশ। আমার জন্ম এখানে। আমি কেন ইন্ডিয়া যাব? কথাটায় যুক্তি যে নেই তা নয়। আসোলে তারও ওই দেশটাকে অতদিন নিজের দেশ মনে হয়নি। মা-বাবার হাত ধরে সেই কোন কালে দেশ ছেড়েছে পুরোপুরি মনেও নেই। কিন্তু শেষ

কয়টা দিন বাবা এমনভাবে সবকিছু বর্ণনা করেছে, এখন মনে হয় বাবা নয়, সে নিজেই যেন ধানক্ষেতে পাকা ধান রেখে আর গোয়ালে বাঁধা গরুর গলা থেকে দড়ি খুলে দিয়ে ভোররাতে পালিয়ে এসেছে এখানে। শেষদিকে বাবা প্রায়ই আবোলতাবোল বকত। প্রায়ই বলত দুধেল গাইটা বড়ো বেশি বেয়াদব। পাকা ধান দেখলে আশপাশে আর কিছুই দেখে না। সোজা গিয়ে ধানক্ষেতে নেমে পড়ে। যেন তার জন্যই ধানগুলো পেকেছে। বাবা আফসোস করত– দুধেল গাইটাও ছেড়ে দিয়ে আসলাম। সকাল হবার আগেইতো ক্ষেতের অর্ধেক শেষ করে দেবে। ছেলেকে নাম ধরে বলত– তুই গিয়ে প্রথমেই দুধেল গাইটাকে গোয়ালে তুলবি। না হলে ধানগুলো সব নষ্ট হয়ে যাবে

চল্লিশ বছর আগে ছেড়ে আসা গাই নিয়ে এখনো ভাবে তার বাপ। চল্লিশ বছর আগে রেখে আসা পাকা ধান এখনো গোয়ালে তোলার কথা ভাবে তার বাপ। রহমত আলীর প্রথম প্রথম হাসি পেত। কিন্তু বাপ মরে যাবার পরে সে প্রায়ই স্বপ্নে দেখত সেই ধানক্ষেত। সেই বেয়াদব দুধেল গাই। মাঝেমাঝে দিনের বেলায়ও খেই হারিয়ে ফেলত সে। মনে হতো যেন তার ভেতরে তার বাবার আত্মা ভর করেছে। আর তখন থেকেই সে তার নিজের দেশে ফিরে যাবার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। কিন্তু মেয়ে রাজি না। মেয়ে বলে ওটা ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়াতো আমার জন্য বিদেশ। আমি কেন যাব

কথাটা সত্য। রহমত আলী পাত্র খুঁজতে শুরু করে। বলা যায় না দেরি করলে বাবার মতো সেও না আবার চলা ফেরার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তার চেয়ে মেয়ের একটা ব্যবস্থা করে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় চলে যাওয়াই ভালো। পাত্র পাওয়াও গেলো। পাত্র জোগাড়ের পর তার কাজ হলো দুটো। এক- কিছু জমি বিক্রি করে নিজের দেশে গিয়ে বাকি কয়টা দিন থাকার ব্যবস্থা করা। আর দুই- বাকি জমিজমাগুলো মেয়ের নামে লিখে দেওয়া। এখানে সে কোনো পিছুটান কিংবা দায়িত্ব রেখে যেতে চায় না। মেয়ের বিয়ের টাকা তার আলাদা করে জমানোই ছিল

সবকিছু হয়ে গেলো খুব অল্প সময়েই। বিয়ের পর নয় দিন রহমত আলী ঘুরে বেড়াল আত্মীয় স্বজনের বাড়ি বাড়ি। বিদায় নিল। তারপর মেয়ের বাড়িতে একবেলা ভাত খেয়ে রওয়ানা দিলো নিজের দেশের উদ্দেশ্যে

চিঠি লিখত রহমত আলী। মাসে দুমাসে তার চিঠি আসত। সায়বান বিবিও লিখত বাবাকে। মাঝেমাঝে সায়বান বিবির চিঠির ভেতর নিজামউদ্দিনও শ্বশুরের জন্য আলাদা একটা চিরকুট লিখে ভরে দিত। তেমন কিছু না– আমরা আল্লার রহমতে আর আপনাদিগের দোয়ায় ভালো আছি। আমাদিগের জন্য চিন্তা করিবেন না। শরিলের দিকে নজর রাখিওন। মুরব্বি গণকে সালাম আর ছোটদিগকে আদর দিওইন

রহমত আলী চলে যাবার কিংবা দেশে যাবার পর বেঁচেছিল এগারো বছর। ওখানে সে একটা চায়ের দোকান দিয়েছিল। বলেছে তার গ্রামে এখন মানুষ চা কিনে খায়। বেশ বড়ো একটা বাজারও হয়ে গেছে। সে তার বাপের ভিটাতে একটা ঘর তুলে থাকে আর বিকেলে বাজারে চা বিক্রি করে। একা মানুষ। বেশ চলে যায়

এই এগারো বছরে সায়বান বিবির ছেলে মোস্তফার বয়স হয়ে গেছে দশ বছর। প্রাইমারি ইস্কুল ছাড়ি ছাড়ি করছে। স্বামী নিজামউদ্দিনও কাটাচ্ছে নিশ্চিন্ত জীবন। এর মাঝে বৌ আর সংসার নিয়ে সে অন্য সবার থেকে ভালোই ছিল। কিন্তু যেই শ্বশুর মরার খবর এল তখন থেকেই সায়বান বিবির মাথাটা বিগড়াতে শুরু করল। অবশ্য প্রথম প্রথম এটাকে নিজামউদ্দিনের কাছে খারাপতো নয়ই বরং ভালো লক্ষণ বলেই মনে হয়েছে। শ্বশুর মরার খবর আসার পরপরই একদিন সায়বান বিবি তাকে বলল তার বাপ নাকি একবার লিখেছে যে সে তার বাবার বর্ণনা অনুযায়ী গ্রামে কিংবা বাড়িতে একটা জিনিসেরও মিল পায়নি। গ্রামের কাঁচা রাস্তা এখন পাকা হয়ে গেছে। সেই গরু আর ধান ক্ষেতেরও কোনো হদিস নেই। ধানক্ষেতে অনেকগুলো কাঁচা ঘর তুলে তার ওয়ারিশানরা ঘরভাড়া দিয়েছে। গ্রামের পাশেই একটা কারখানা হওয়াতে অনেকেই এখন ভাড়া ঘরে থাকে। ধানক্ষেতে ধান চাষের চেয়ে ঘরভাড়া দেয়া লাভজনক। বাপের বর্ণনার কোনো কিছুতে মিল না পেলেও সে নিজের একমাত্র স্মৃতিকে পেয়েছে অত বছর পরেও। বাড়ি থেকে রাস্তায় ওঠার মুখে যে বটগাছটা ছিল। সেটা অবিকল আছে আগের জায়গায়। একটু শুধু বড়ো আর বুড়ো হয়েছে। সেই বটগাছের লতায় ঝোলার স্মৃতিটাই তার ফেলে আসা ভিটের একমাত্র স্মৃতি, যেটা অত বছর পরও সে

মনে করতে পারে। এ থেকেই তার মনে হয়েছে যে একমাত্র গাছই শুধু অবিকল থাকে পুরোনো মানুষকে ভিটে চিনিয়ে দিতে। মানুষ সব ভুলে গেলেও গাছের স্মৃতি ভোলে না। তাই সে ওখানে চা দোকান দেবার সাথে সাথে সারাদিন গাছ লাগায়। কী গাছ। কার মাটিতে লাগাচ্ছে। কে ফসল খাবে সেটা কোনো কথা নয়। কথা হলো গাছ লাগানো আর গাছকে বড়ো হতে দেয়া। ...সে নিজের টাকায় বীজ কিনে চারা করে রাস্তার পাশে কিংবা মানুষের বাড়িতে লাগিয়ে দিয়ে আসে। মেয়েকেও সে বলেছে বাড়িতে গাছ লাগাতে। যদি এখান থেকেও তাকে কোনো দিন উচ্ছেদ হতে হয় তাহলে ফিরে এসে গাছ দেখেই সে চিনতে পারবে তার ভিটে

কথাটা নাকি অনেকদিন আগে লিখেছিল রহমত আলী। সায়বান বিবির তখন এটাকে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে মনে হয়নি। কিন্তু যখন রহমত আলী মরার খবর এল। সায়বান বিবি একটুও কাঁদল না। সে গিয়ে খুলে বসল বাবার চিঠির বান্ডিল। নিজামউদ্দিন একটু অবাক হলেও ভাবল বউ হয়ত বাবার শোক ভুলতে চাইছে তার চিঠিগুলো বারবার পড়ে। থাকুক সে তার মতো। একেকজনের তো শোক প্রকাশের ধরন একেক রকম হতেই পারে। সে নিজে থেকেই শ্বশুরের আত্মার শান্তির জন্য মৌলবি ডেকে মিলাদ পড়াল। মিলাদের রাতেই সায়বান বিবি স্বামীর কাছে জীবনের প্রথম আব্দার করল। বলল তাকে কিছু গাছের চারা এনে দিতে হবে। বাড়িতে গাছ লাগাবে। নিজামউদ্দিন মনে মনে খুশিই হলো। জীবনে এই প্রথম বৌ তার কাছে আব্দার করল। খারাপ কী। সে পরের দিনই অনেকগুলো ফসলি গাছের চারা এনে দেয়। বাড়িতে এমনিতেই অনেক গাছ ছিল। তার পরও সায়বান বিবি নিজের হাতে লাগাল বাড়ির চারপাশে। তিন বিঘা বাড়ি। অনেক জায়গা। সায়বান বিবি আরো চারা চাইল। নিজামউদ্দিনও এনে দিলো। সায়বান বিবি ছেলে মোস্তফাকেও বলে দিলো যেখানে যত চারা পায় যেন নিয়ে আসে। মোস্তফাও মায়ের সাথে বেশ উৎসাহে গাছের চারা আনা আর লাগানোতে মনোযোগ দিলো। নিজামউদ্দিন তাতেও আলাদা কিছু ভাবল না। ভাবল বাপের শোক ভুলতে সায়বান বিবি গাছের চারা লাগাচ্ছে। লাগাক না। গাছ বড়ো হলে তো ক্ষতি নেই। পয়সাও আসবে

যে সায়বান বিবি নিজের জন্য কোনোদিন কিছু চায়নি সে এখন নিয়মিত গাছের চারার আব্দার শুরু করল। নিজামউদ্দিন একটু আপত্তি করল। চারা কিনতেতো পয়সা লাগে। তাছাড়া কয়েকশো চারা এর মধ্যে লাগানো হয়ে গেছে। এগুলো বড়ো হলেই পুরো বাড়ি জঙ্গল হয়ে যাবে। সায়বান আর কিছু বলল না নিজামউদ্দিনের আপত্তির মাথায়। কিন্তু পরের দিন থেকে সে ছেলেকে নিয়ে গ্রামে বের হয়ে গেলো। যার বাড়িতে যে গাছের চারা পাওয়া যায় তাই নিয়ে আসতে শুরু করল বোঝা করে। ফসলি– অফসলি– জংলি কোনো বাছ বিচার নেই। গাছের চারা আনা– লাগানো আর তাতে পানি দেয়া, এই হয়ে পড়ল সায়বান বিবির নিত্য রুটিন

গাছগুলো বড়ো হতে শুরু করল। কিন্তু সায়বান বিবির আর চারা লাগানো শেষ হয় না। তিন বিঘা বাড়ির পুরোটা জুড়ে সে চারা লাগাতে শুরু করল। তাতেও অসুবিধা নেই। কিন্তু সঙ্গে সে আরেক কাণ্ড শুরু করে দিলো। সে নিজামউদ্দিনকে আর কোনো আগাছাও কাটতে দিতে রাজি না। বলে ওগুলোওতো গাছ। কাটবে কেন? থাক

বাড়ির একটা বড়ো উঠান ছিল। এখন ঘর থেকে বের হবার একটা রাস্তা ছাড়া আর কিছু নেই। গাছ আর গাছ। নিজামউদ্দিন একদিন কড়া করে আপত্তি তুলেছিল। কিন্তু তাকে থেমে যেতে হয়। সায়বান বিবি শুনিয়ে দিয়েছে বাড়িটা নিজামউদ্দিনের নয়। তার নিজের। তার বাপ ইন্ডিয়া যাবার আগে তার নামে লিখে দিয়েছে

বন্ধু বান্ধবরা হাসাহাসি শুরু করল। গ্রামে জানাজানি হতে বাকি থাকল না বিষয়টা। আর এও সবাই জেনে গেলো যে নিজামউদ্দিন বৌকে কিছু বলতে পারে না ঘরজামাই বলে। এ তো মহা মুশকিল। শ্বশুরের সম্পত্তি নিয়ে বিয়ে করে যে খোঁটা শুনতে হয়নি। সেই খোঁটা এখন শুনতে হচ্ছে। নিজামউদ্দিন তার ছেলেকে দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করল। কিন্তু ছেলেও মায়ের মতো। তাকেও পেয়েছে গাছের নেশায়

সায়বান বিবি একদিন নিজামউদ্দিনকে বলল বাড়ির উঠানের উপর চলা-ফেরার জন্য বাঁশের মাচান করে দিতে। কারণ উঠানের উপর দিয়ে হাঁটতে গেলে ঘাসের ক্ষতি হয়। নিজামউদ্দিন সরাসরি না করে দিলো এই প্রস্তাবে। পাশাপাশি এও বলে দিলো যে এইসব ফাজলামি বন্ধ করতে হবে

কিন্তু পরের দিন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়তে হলো নিজামউদ্দিনকে। সায়বান বিবি পানির দরে আধ বিঘা ধানের জমি বিক্রি করে বাঁশ কিনে কামলা এনে সারা উঠানে বাঁশের মাচা করছে। এইবার নিজামউদ্দিনের মনে হলো কিছু একটা করা দরকার। সে পরামর্শ করল বন্ধু বান্ধবদের সাথে। কেউ কোনো সুরাহা দিতে পারে না। সবাই বলে বোঝাতে। কেউ কেউ নিজেই এল সায়বান বিবিকে বোঝাতে। কিন্তু তার এক কথা– খারাপ কী কাজ করছি আমি?

এবার আরেক কাজ করে বসল সায়বান। এক বিঘা জমি বিক্রি করে পুরো বাড়িতে কাঁটা তারের বেড়া দিলো। ঘরের পেছনে বেশ বড়ো একটা দাওয়া ছিল। সায়বান বিবি সেখানেও কিছু গাছ লাগিয়ে দিলো

নিজামউদ্দিনের সংসার করা শেষ। সায়বান বিবি কোনো কথা বলেও না আর। কোনো দিকে তার কোনো মন নেই। পাঁচ পাঁচটা বছর কাটল। বাড়িটাকে এখন আর বাইরে থেকে দেখলে কোনো মানুষ বসবাস করে বলে মনে হয় না। ...আর সম্ভব নয়। কোথায় কোন গাছে ফুল ফুটেছে। কোন গাছে ফল ধরেছে। কোন গাছ কত বড়ো হলো। কোনটার ডাল ভেঙে গেলো এই নিয়ে সংসার করা যায় না। ছেলে মোস্তফার দিকেও সায়বানের কোনো খেয়াল নেই। রান্না হলো কি না কিংবা ছেলে ভাত খেলো কি না তার চেয়ে বড়ো হয়ে উঠল কোন গাছে পানি দিতে হবে আর কোন গাছের ডাল বেঁধে দিতে হবে। এই

নিজামউদ্দিন হাল ছাড়ল। কিন্তু তালাকের কথা চিন্তা করেনি সে। কথাটা সায়বান বিবিই তুলল। বলল আমার সাথে যখন তোমার হবে না। তখন তুমি একেবারেই যাও। নিজামউদ্দিন কথাটাকে তেমন পাত্তা না দিলেও তার এক বন্ধু বলল এটাই সবচে ভালো। কারণ সায়বান বিবি যা করছে তা মানুষের কাজ না। নিশ্চয়ই কোনো জ্বিন-ভূতের কাজ। যেহেতু সায়বান বিবি এখন নিজামউদ্দিনকে শত্রু মনে করে। সেহেতু সেই জ্বিন দিয়ে নিজামউদ্দিনের যে কোনো ক্ষতিও করাতে পারে সে। অবশ্য শত্রু মনে করার কারণ হলো একদিন সকালে সায়বান বিবি দেখে তার উঠানের অনেকগুলো গাছ কাটা। গাছ কাটা দেখে সে এর জন্য কোনো দোষারোপ করে না নিজামউদ্দিনকে। বরং সোজা বলে দেয় এই বাড়ি আমার। আমার বাবা এই বাড়ি আমাকে দিয়ে গেছে। তুমি আর এ বাড়িতে থাকতে পারবে না। তুমি তোমার বাপের বাড়ি যাও। আমার ছেলেকে নিয়ে আমি থাকব এখানে

সায়বান বিবির চোখে এমন এক রোশনাই ছিল যে নিজামউদ্দিন সে দিনই বাড়ি ছাড়ল। তারপর সালিশ এবং হুজুর দুটোই করে দেখেছে। সায়বান বিবি তার কথা কিংবা কাজ থেকে এক চুলও নড়ে না। নিজামউদ্দিন ভাবল হয়ত এর একটা বিহিত হবে। কিন্তু এর মধ্যে সায়বান বিবি নিজেই পাঠাল তালাকের প্রস্তাব। সত্যি কথা বলতে কি এ প্রসঙ্গটি নিয়ে পরিচিতজনদের সাথে আলাপ করে নিজামউদ্দিন কিছুটা ভয়ও পেয়ে গেলো। যদি সত্যি সত্যিই সায়বান বিবির উপর ভূতের আসর থাকে তাহলে সে ভূত তারই ক্ষতি করবে। কারণ মোস্তফা সায়বান বিবির নিজের ছেলে। ভূত হলেও তো সে মা। পেটের ছেলের ক্ষতি করবে না। সুতরাং মোস্তফাকে নিয়ে এখন চিন্তা না করলেও চলে

সাক্ষী ডেকে নিজামউদ্দিন তালাক দিলো সায়বান বিবিকে। সায়বান বিবি অবশ্য দেনমোহরের যাবতীয় দাবি সাক্ষীদের সামনেই ক্ষমা করে দিলো। এক দিক থেকে সুবিধেই হলো নিজামউদ্দিনের। না হলে দেনমোহরের নামে যে জায়গাটা ছিল সেতো এখন আর নেই। ওটা বহু আগেই নিজামউদ্দিন বিক্রি করে দিয়েছে। ভূতের আরেকটা গুণ আবিষ্কার করল নিজামউদ্দিন

তালাকের পর ছেলেকে নিয়েই সংসার সায়বান বিবির। ছেলে পড়া ছেড়ে দিয়েছে বেশ কিছু দিন। মায়ের কাণ্ডকারখানা সে উপভোগই করে বলতে হয়। বাপের অবর্তমানে ধানের জমিগুলো নিজেই দেখে। মা ছেলের সংসারে

মানুষ কম। অত ঘরের কী দরকার? তাই একপাশের ঘর ভেঙে সে ভিটায় কিছু গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করল সায়বান বিবি। এক সময় নিজে যে ঘরে থাকে সে ঘরেও কিছু গাছের চারা লাগাল। কিন্তু চারাগুলো ছায়ায় থেকে থেকে কেমন যেন হয়ে যাচ্ছিল। ঠিকমতো বেড়ে উঠতে পারছিল না। তাই সায়বান বিবি শাবল নিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে একপাশের চালের টিন খুলে ফেলল। এইবার ছেলে কিছুটা আপত্তি করল। বলল ঘরের ভেতরের গাছগুলো কেটে ফেলতে। কিন্তু সায়বান বিবির একটাই কথা– গাছ তো তোর কোনো ক্ষতি করে না বাজান। থাক। আমার জন্য আর কত জায়গা দরকার? গাছগুলা থাক

কিছুদিন পর ছেলে মোস্তফার থাকার ঘর আর রান্না ঘর ছাড়া সায়বান বিবির ঘর পুরোটাই হয়ে উঠল গাছের ভিটে। সায়বান বিবি তার ঘরের সম্পূর্ণ চাল খুলে নিজে থাকার জন্য এসে আশ্রয় নিল রান্নাঘরে। কিন্তু একদিন মোস্তফা দেখে তার মা রান্নাঘরেও কিসের যেন চারা লাগিয়েছে। মোস্তফার ঘোর আপত্তির মুখে সায়বান বিবি বলে– এই দেশে আমার কোনো ভাই বেরাদর নেই। যদি আমাকেও উচ্ছেদ হয়ে যেতে হয় তবে অনেক দিন পর ফিরে আসলে কে আমাকে চিনবে? তাই গাছ লাগাই। গাছ থাকলে গাছ আমাকে চিনবে

অবস্থা দেখে আর বাবা নিজামউদ্দিনের কথায় মোস্তফারও একদিন মনে হলো তার মায়ের আসোলে জ্বিনের আসর। থাকা যাবে না। কিংবা থাকা উচিত হবে না তার সাথে। একদিন মোস্তফা কথা তুলতেই সায়বান বিবি বলল তুই তোর বাপের সাথে গিয়ে থাক। ধানের সাড়ে সাত বিঘা জমির মধ্যে পাঁচ বিঘা তোর নামে লিখে দেবো। বাকি আড়াই বিঘা জমি আর বাড়ি থাকবে আমার নামে। আমি মরলে তুই পাবি। এই আড়াই বিঘা জমিতে যা ধান হবে তার অর্ধেক তুই আমাকে দিবি যতদিন বাঁচি। তাছাড়া বাড়িতে এখন অনেক ফল হয়। আমার চলে যাবে

ছেলে মোস্তফা যাবার পর সায়বান বিবি আর এক মুহূর্তও দেরি করে না। শুধু রান্নাঘরটি রেখে পুরো বাড়িটাই ভেঙে ফেলে। পুরো ভিটা জুড়ে লাগিয়ে দেয় নানান জাতের গাছ

এর পরে পাঁচ বছর গেছে। মাঝেমাঝে মাকে খাই খরচ দিতে আর বাড়ির ফল নিতে আসত মোস্তফা। এর মধ্যে সায়বান বিবির রান্নাঘরও জঙ্গল হয়ে গেছে। শুধু এক পাশে একটা চাল কোনোমতে টিকে আছে। তাও কোনো খুঁটির সাথে নয়। সায়বান বিবি জ্যান্ত গাছকেই ঘরের খুঁটি হিসেবে ব্যবহার করে। ঘরের দৈনন্দিন ঘটি বাটি সব ঝুলিয়ে রাখে গাছের ডালে। শুধু একটু ফাঁকা জায়গা আছে। সেটি চুলার। যদি গাছের উপরে চুলা বানানো যেত তাহলে হয়ত সায়বান বিবি তাই করত। এখন সে ঘুমায় গাছে হেলান দিয়ে

গত পঞ্চাশ বছরে নাকি এরকম ঝড় হয়নি। সকালে উঠেই নিজামউদ্দিন ছেলে মোস্তফাকে ডেকে অনেক বছর পর রওয়ানা দেয় সায়বান বিবির বাড়ির দিকে। বাড়িতো নয়। গহিন জঙ্গল। এখন উঠান কিংবা রাস্তা বলতে কোনো কিছু বাকি নেই। গাছের ডাল ধরে ধরে ফাঁকে ফাঁকে গিয়ে পৌঁছাতে হয় সায়বান বিবির থাকার জায়গায়। অবশ্য মোস্তফা তা জানে। সে মাঝে মধ্যে আসে

মোস্তফা ডাকাডাকি করেও কোনো উত্তর পায় না সায়বান বিবির। এগিয়ে যায়। ঝড় আর বৃষ্টিতে লেপ্টে আছে গাছগুলো। অনেক গাছের ডাল ভাঙা। চুলার কাছে গিয়ে পাওয়া যায় সায়বান বিবিকে। একটা গাছ জড়িয়ে ধরে ঘুমাচ্ছে। নিজামউদ্দিন এগিয়ে গিয়ে হাত দিয়ে ঠেলা দেয়। ঠেলা খেয়ে সায়বান বিবি তার শক্ত আর ভেজা দেহটা নিয়ে গড়িয়ে পড়ে আরেকটা গাছের শেকড়ের উপর

২০০৫.১০.২৮

প্লানচেট

একেবারে কোনার টেবিলে বসেছি আমরা। আমার উল্টোদিকে একটা চেয়ার। তারপর দেয়াল। বামপাশের চেয়ারটা খালি। ডানপাশের চেয়ারে সে বসা। তিন নম্বর পেগে দুয়েক চুমুক হয়ে গেছে আমাদের। গোলাপি আমেজ আসতে শুরু করেছে একটু একটু করে

কনুইটা টেবিলে ঠেকিয়ে ডানহাতে মাথা ভর দিয়ে সে বামহাতে তার গ্লাসটা নাড়াচাড়া করছে। তাকিয়েও আছে গ্লাসে। ওভাবে থেকেই জিজ্ঞেস করল– তোরা আমাকে খুব ভাগ্যবান মেয়ে মনে করিস। তাই না?

উত্তর দিতে আমি সময় নিলাম। কিংবা আপনাতেই সময় নেয়া হয়ে গেলো। আরেক ঢোক মুখে ঢেলে এমনভাবে গিললাম যাতে শব্দ না হয়। আমাকে ভাবতে হচ্ছে। প্রশ্ন না করলেও তার এরকম জিজ্ঞাসার উত্তরে জীবনীকাররা ভাগ্যবতী ভাগ্যবতী লিখতে লিখতে প্রকাশনা অধিদপ্তর ফাটিয়ে ফেলে। কোথাও প্রসঙ্গটা পেলে আমিও নেহাত দশ-বিশবারের কম তাকে ভাগ্যবতী কিংবা ভাগ্যবান নারী বলতে ছাড়তাম না। কিন্তু এখন প্রশ্নটা সে নিজেই করেছে, করেছে একমাত্র আমাকে এবং উত্তরটা একমাত্র সেই শুনতে চায়। এবং... প্রশ্নটা গোলাপি মুহূর্তের, সুতরাং কোথাও একটা কী আছে। সুতরাং বক্তৃতা-সাক্ষাতকার কিংবা প্রবন্ধের পরিস্থিতিতে এখানে হ্যাঁ বলার জায়গা নেই। আমি আরেক ঢোক গলায় ঢেলে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম

গ্লাস নাড়াচাড়া করা হাত দিয়ে সে অযথাই শাড়ির আঁচল ঠিক করল। সোজা হয়ে বসে দুই হাতের কোষে গ্লাসটা ধরে চোখ বন্ধ করে এক ঢোক গিলে ওভাবেই গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখল। কিন্তু ছাড়ল না। ধরেই থাকল। তারপর বেশ টানটান হয়ে আবার জিজ্ঞেস করল– তোরা সবাই আমাকে খুব সৌভাগ্যবান মেয়ে ভাবিস তাই না?
আমি পাশ কাটিয়ে গেলাম– সহজ হিসেবেতো তাই ভাবার কথা
– সহজ হিসেব। সহজ হিসেব
কথাটা সে কয়েকবার আওড়াল। তারপর গ্লাস থেকে সরিয়ে হাত দুটো আড়াআড়ি টেবিলে পেতে মাথাটা নামিয়ে আনল হাতের উপর। তার চোখ নিচের দিকে। তখনও সে বিড়বিড় করছে– সহজ হিসেব। সহজ হিসেব। সহজ হিসেব নামে যে হিসেব করা হয় তা কি সবার ক্ষেত্রেই সহজ হয়? হয় না। তোরা কেউই আমাকে নিয়ে কোনো হিসেবই করিসনি

এবার মুখটা ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল একই অবস্থায় থেকে। একটু হাসল– কোনো দিন ভেবেছিস আমাকে নিয়ে?
– তোকে অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে
– জানি। সেই বাড়ির বৌ হবার জন্য আমার একমাত্র যোগ্যতা বিবেচনা করা হয়েছিল সৌন্দর্য
– তখনতো তুই একটা বাচ্চা মেয়ে ছিলি
– যারা আমাকে সংগ্রহ করেছিল তারা বুঝতে পেরেছিল বড়ো হলে আমি সুন্দরী হব
– আজ তোকে বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে লালপেড়ে সবুজ শাড়ির জন্য
– তাও জানি। কলকাতায় আমাকে কয়েক বছর রেখে এসব শেখানো হয়েছে

সে আবার ডান হাতে মাথা ঠেস দিয়ে তাকাল সরাসরি– আচ্ছা, এই যে বললি আমি সুন্দর। সত্য করে বল তো আর কোনো দিন আমাকে নিয়ে আলাদাভাবে এইটুকুও কি তুই ভেবেছিস? নাকি অন্য কেউ ভেবেছে? ...ভাবেনি। তুইও ভাবিসনি। ভাবার দরকারটাই বা কী? আমিতো আর বিশিষ্ট কেউ না। তোরা আমার নাম মুখস্থ করেছিস আমি তোদের কবির বিয়ে করা বৌ বলে

– নিঃসন্দেহে এটা একটা বড়ো পরিচয়
– কার?
– কেন? তোর
– আমি কে?
– তুই মানে... আমাদের কবির স্ত্রী
– তোদের কবির স্ত্রী

হাসল। গ্লাসটা খালি করে ফেলল এক ঢোকে। আমার আরো কাছে মুখটা এগিয়ে এনে ঘুম জড়ানো গলায় বলল– কিন্তু আমি একটা রক্ত মাংসের আলাদা মানুষ। সাধারণ মানুষ। স্বামী-সন্তান-সংসার নিয়ে স্বপ্ন দেখার মতো সাধারণ মানুষ
– তাতে সমস্যাটা কোথায়?
– বিয়েটা যখন হয়েছে তখন পর্যন্ত আমারও মনে হয়েছিল সমস্যাতো কোথাও নেই। স্বামী পাচ্ছি। সংসার পাচ্ছি। কিন্তু বিয়ে হবার পর দেখলাম আমি স্বামী কিংবা সংসার কোনোটাই পাইনি। আমি তোদের তোদের কবির বউ হয়ে গেছি
– বুঝিনি
– না বোঝার কী আছে? তোরাতো বহু কিছুই বুঝিস। তোদের কবি নাকি পুরো জাতিটাকেই অনেক বেশি বুদ্ধিমান করে দিয়ে গেছেন তার সৃষ্টিকর্ম দিয়ে
– দ্যাখ আমি এখন অনেকটা টাল। অত ঘোরপ্যাঁচ ধরতে পারব না। খোলাসা করে বল

খালি গ্লাসটা নিয়ে আলতো কয়েকটা টোকা দিলো টেবিলে। বরফের ছোট্ট একটা কুঁচি তুলে মুখে দিয়ে টেবিল ক্লথে আস্তে আস্তে ভেজা আঙুলগুলো ঘষতে লাগল। টেবিলে আঙুল দিয়ে আল্পনা কাটতে কাটতে সেদিকে তাকিয়েই আবার সরব হয়ে উঠল– তোদের কবির জীবন বিত্তান্তের ছকে পেশা-শখ-জন্ম তারিখের পাশাপাশি আরেকটা ঘর হচ্ছে স্ত্রীর নামের ঘর। তার সাথে আমার বিয়ে হওয়ায় আমার প্রাপ্তি ঘটেছে তার জীবন বিত্তান্তের ছকে আধাইঞ্চি জায়গা। এর বেশি কিছুই নয়। তার জীবনীকারেরা দু-তিনশো পাতার বইয়ের দু তিন জায়গায় আমার নামটা ব্যবহার করে তোদের কাছে আমাকে পরিচিত করে দিয়েছেন। কিন্তু এছাড়া...?
– কী এছাড়া?
– আমার জীবন? আমার জীবনী? আমার কীভাবে কেটেছে ভেবেছিস কোনোদিন?
– ভাবার সুযোগ কোথায়? তুইতো একটা গৃহবধূই ছিলি
– দ্যাটস রাইট। একটা গৃহবধূ। পারিবারিক ছবিতে যার জন্য একটা নির্ধারিত স্থান থাকে। কবির জীবনী লিখলে যার জন্য এক লাইনের একটা জায়গা রাখতে হয়। সেই গৃহবধূ?
– তা ছাড়া?

হাতের ইশারায় ওয়েটারকে আরো সার্ভ করতে বলে সে আমার দিকে ঘুরল– তুই তোদের কবির জীবনী পড়েছিস?
– হ্যাঁ
– কয়টা?
– দুটো
– পড়ে কি তোর কোথাও মনে হয়েছে যে তিনি একজন স্বামীও ছিলেন?
– জীবনীগুলোতো আর জীবন বিত্তান্ত নয়। ওগুলো তার কবি-জীবন নিয়ে লেখা
– কোথাও কি দেখেছিস তার জীবনে তার কবি-জীবনের বাইরে কোনো কিছু ছিল?
– এজন্যই তাকে আমরা কবিগুরু বলি। তিনি মহান ছিলেন বলেই পুরো জীবনটাকে কবিতা কেন্দ্রিক করতে পেরেছিলেন ব্যক্তিজীবনের ঊর্ধ্বে উঠে
– কিন্তু আমি তার ভক্ত ছিলাম না। ছিলাম স্ত্রী

– অবশ্যই
– তাহলে আমার কী হলো?
– মানে?
– তিনি বিয়ে করলেন আমাকে। আর সব কিছু দিয়ে দিলেন তোদেরকে। বিষয়টা কী দাঁড়াল তাহলে?

ওয়েটার আসায় সে চুপ করল। ওয়েটার খালি গ্লাসগুলো সরিয়ে আরো ছয়টা গ্লাস রাখল। আমি জিজ্ঞেস করলাম– কাবাব দিতে বলব?
– নারে অভ্যাস নেই। পিরালি বামুনের বাড়িতে প্রায় বিধবার অভ্যাস করেছি আমি। এখন খেলে আবার তোদের কবির অসম্মান হতে পারে
একা একাই হেসে উঠল খিলখিল করে। মাথার চুলগুলো হাত দিয়ে ঠিক করে আধমাথা ঘোমটা টেনে ওয়েটারের দিকে ফিরে বলল বেশি করে ঝাল মিশিয়ে বাদাম দিতে– তুই খেলে কাবাব দিতে বল
– না পোড়া মাংস খেলে আমার অ্যাসিডিটি হয়
– আমার হয় লেবু খেলে

খুব যত্ন করে দুটো গ্লাস বানাল সে। একটা আমার দিকে বাড়িয়ে নিজেরটা টেনে এক চুমুক মুখে দিলো। গ্লাসটা টেবিলে রেখে শাড়ির খুঁট আঙুলে প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে বলল– তোদের কবি সারা জীবনে কখনো শ্বশুর বাড়ি গেছেন বলে শুনেছিস?
– না
– কিন্তু তার একটা শ্বশুর বাড়ি ছিল। আমার বাবার বাড়ি। মেয়ের জামাই শ্বশুর বাড়ি না এলে আমাদের মতো মানুষের মা-বাবার লাগে
– তিনি ব্যস্ত মানুষ...
– ব্যস্ত মানুষ। ...সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বিদেশি বান্ধবী ভিক্টোরিয়ার বাড়ি যাওয়া যায়। বুড়ো বয়সের কিশোরী বান্ধবী মৈত্রেয়ীর বাড়ি যাওয়া যায়। শুধু জীবনে একবারও শ্বশুর বাড়ি যাওয়া যায় না। তাতে কবিতার ক্ষতি হয়

পুরো গ্লাসটা সে এক ঢোকে খেয়ে ফেলল। আমি তার হাত ধরলাম– তারি... বেশি খাওয়ার দরকার নেই। আস্তে আস্তে খা
– ভয় নেই। তোদের কবির জীবনী যা লেখার তা লেখা হয়ে গেছে। এখন আমি মাতাল হলেও আর তার কিছু যায় আসে না। ...তবে তোকে থ্যাংকস। তুই আমার আসোল নামটা ধরে ডাকিস এ জন্য। তোদের কবির দেয়া নামে আমাকে কেউ ডাকলে আমার গা রি রি করে
– কিন্তু ওটা একটা অসাধারণ নাম
– আমিও তাই ভেবেছিলাম, যখন প্রথম আমার নামটা পাল্টানো হয়। ভবতারিণী। একেবারেই সেকেলে নাম ছিল আমার। সেটা পাল্টে যখন তিনি মৃণালিনী দিলেন তখন ভাবলাম এ তার অসাধারণ ভালবাসারই প্রকাশ। কিন্তু হা ভগবান... পরে দেখলাম নাম দেয়া তার কবিত্বেরই একটা অন্য রকম খেলা। তিনি হাজার হাজার মানুষ-গাছ-পাখি-দালান কোঠা, সব কিছুর নাম দিয়েছেন। তার সাথে আমারও একটা নাম। কোনো বিশেষত্ব নেই এতে। আমি কোনোভাবেই তার কাছে বিশেষ কেউ নই। তার কাছে গিয়ে যদি কেউ বলত যে গরু শব্দটা একটা পুরোনো শব্দ। তাহলে তিনি হয়ত গরুর জন্যও হাম্বামৃগ বা এই জাতীয় কোনো কাব্যিক একটা নাম ঠিক করে দিতেন। ...তখন থেকেই এই নামটা শুনলে আমার গা ঘিনঘিন করে। হোক পুরোনো। তবুওতো ভবতারিণী আমার নিজের নাম। আমার মা-বাবা ওই নামটা আমার জন্যই বাছাই করেছেন

ওয়েটার বাদাম দিয়ে দুটো খালি গ্লাস নিয়ে গেলো। পঞ্চম পেগটা বানিয়ে আমি তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। গ্লাসটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে রইল। এরপর এক চুমুক দিয়ে টেবিলে থুতনি ঠেকিয়ে আমার দিকে অপলক তাকিয়ে রইল– আমি অনেক দিন তার থেকে দূরে থেকেছি। কলকাতায়। বিয়ের পর ওখানে আমাকে পড়ার জন্য পাঠানো

হয়েছিল। কিন্তু তিনি আমাকে কোনো চিঠি লিখেননি। তিনি চিঠি লিখেছেন তার বৌদিকে। ভাতিজি ইন্দিরাকে। এবং দেশি বিদেশি অসংখ্য বান্ধবীকে। ... কেন জানিস? আমি কবিতা বুঝতাম না। কবিতা না বোঝা বউয়ের কাছে চিঠি লেখার চেয়ে কবিতা বোঝা বউদি কিংবা রোম্যান্টিক ভাতিজিকে চিঠি লেখা অনেক শান্তির

নেশা জমে উঠেছে। বারবার সে একবার টেবিলে থুতনি ঠেকিয়ে আরেকবার হাতে মাথা ঠেকিয়ে মাথার ওজন অন্য কোথাও রাখার চেষ্টা করছে– তিনি মোট কতটা বই লিখেছেন বলতে পারবি?
– না। কিন্তু অনেক
– হ্যাঁ অনেক। কিন্তু এর একটা বইও তিনি আমার নামে উৎসর্গ করার দরকার বোধ করেননি। অথচ নামে বেনামে বৌদি কাদম্বরীকে উৎসর্গ করেছেন পাঁচ পাঁচটা বই। এটাকে তুই কী বলবি?

বিষয়টা ঘোরানো দরকার। কিন্তু টাল হলে আমার আর মগজ খাটাতে ইচ্ছা করে না। ভারি ভারি বিষয়– সাহিত্য ফাহিত্য– দুঃখ এসব সহ্য হয় না। টাল হলে বরং খোঁচা টোচা মেরে কোনো পাবলিককে ক্ষেপাতে দারুণ লাগে। এ ক্ষেত্রে আমার সুনাম কিংবা দুর্নাম দুটোই রীতিমতো ঈর্ষণীয়। কিন্তু একে ক্ষেপানোতো যাবেই না, উল্টো ঠিকঠাক মতো বাড়িতে পৌঁছে না দিতে পারলে বাংলা সাহিত্য থেকে আমাকে নির্বাসনে যেতে হবে। কারণ তার স্বামীর চ্যালা চামুন্ডারা সব বাংলা সাহিত্যের মাফিয়া। তারা যদি দেখে যে আমি কবিগুরুর বৌকে নিয়ে কোথাও মাতলামো করছি তা হলে আগামী কাল কোনো দৈনিকেই আর কোনো সংবাদ থাকবে না। আমার গুষ্টি উদ্ধারে ভরে যাবে পত্রিকার পাতা

আমি আস্তে করে তার হাতের উপর হাত রাখলাম– দ্যাখ্ উনি তার সারা জীবন লেখালেখিতেই কাটিয়েছেন। তুই তার স্ত্রী কিন্তু যেহেতু তোর সাথে তার লেখালেখির কোনো শেয়ারিং ছিল না এজন্য হয়ত...
– বুঝলাম। এজন্য আমাকে কোনো বই তিনি দেননি। কোনো চিঠি লিখেননি। তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু ঘরে? ঘরেতো তার সাথে আমার একটা সম্পর্ক ছিল। অথচ সেই ঘরে একটা দিন আমার সাথে হাসেনওনি তিনি। তিনি কীভাবে হাসেন তা আমি দেখেছি মাত্র একদিন। তাও আমার সাথে নয়। আমার সামনে একা একাই হেসেছেন তিনি। আমি পাশে ছিলাম বলে শুনেছি
– কী বিষয়ে?
– বিষয়টা পারিবারিক। শ্বশুর মশাইর কোম্পানি ফর্মেটে বাড়ি পরিচালনার একটা বিষয় নিয়ে। ওই বাড়িতে সকল নিয়ম কানুন তোদের এখনকার একেকটা অফিস কিংবা কোম্পানির মতো বানিয়ে রেখেছিলেন তোদের মহর্ষি। সব কিছুই নির্দিষ্ট করা ছিল। কারো পক্ষেই নিয়মের বাইরে কোনো কিছু পাওয়া ছিল দুরূহ। তখন বাড়ির ক্যাশিয়ার ছিলেন তোদের কবির পিঠেপিঠি বড়ো ভাই সোমেন দা। সবাই তাকে মাথা খারাপ লোক হিসেবেই জানত। কিন্তু তিনি হিসেবে খুব পাকা আর প্রশাসনে কড়া ছিলেন বলে শ্বশুর মশাই তাকেই বাড়ির ক্যাশিয়ার বানান। তখন আমাদের সকালের নাস্তার জন্য বরাদ্দ ছিল লুচি আর আলুর দম। তোদের কবি এসব নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। খেতেন খুবই অল্প। আর যে সব বিষয় সোমেন ঠাকুরের অধীনে সেসব নিয়ে কোনো দিন তিনি ঘাঁটাঘাঁটি করতেও যেতেন না। বলতেন– মস্তিষ্ক বিকৃত লোক যেখানে বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক সেখানে বিদ্রোহ কিংবা অভিমান দুটোই অচল এবং অনুচিত। কারণ এসবের প্রতিক্রিয়ায় তার পক্ষে যে কোনো দিন খাবারে বিষ মিশিয়ে দেওয়া অসম্ভব কিছু নয়

কিন্তু একদিন ভোর বেলা চরতার রস খেয়ে বাগানে হেঁটে ফিরে এসে আমাকে বললেন– তোমাকে একবার সোমেন ঠাকুরের দরবারে যেতে হবে। তাকে গিয়ে বলবে আজও যদি লুচির সাথে আলুর দম থাকে তাহলে আমি অনশন করব। আজ আমার মেনু পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করার দাবি জানাচ্ছি আমি

পারতপক্ষে সোমেন দা'র সামনে কেউ যেতে চায় না। গেলেই তিনি বিভিন্ন নিয়ম-কানুনের উপর একটা বক্তৃতা শুরু করে দেন। কিন্তু এই প্রথম স্বামীর কোনো কাজে লাগলাম এই কথা ভেবে গেলাম সোমেন দা'র কাছে। সোমেন দা' শুনেই হো হো করে হেসে উঠলেন– আমাদের রবি তাহলে খাদ্যের গুণাগুণ এবং স্বাদও বোঝে? হাঃ হাঃ হাঃ যত বড়ো

কবিই হও না কেন খাবারে টান পড়লে আর কবিতা হয় না। হাঃ হাঃ হাঃ... যাও। যেহেতু সে কবিতা বাদ দিয়ে খাদ্য নিয়ে চিন্তিত হয়েছে সেহেতু তার এই জৈবিক প্রয়োজনের দাবি আমি অপূর্ণ রাখব না

সে আরেকটা গ্লাস খালি করে। একা একা হাসে– তোদের কবি হাসলেন এর একটু পরে। খেতে বসে দেখা গেলো সোমেন দা লুচি আর আলুর দম ঠিকই দিয়েছেন। সাথে বাড়তি হিসেবে দিয়েছেন ছানার মিষ্টি। আলুর দমের সাথে মিষ্টি দেখেই তোদের কবি হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন। বললেন– আলুর দমের সাথে ছানার মিষ্টির যে কোনো অন্ত ্যমিল কিংবা ভারসাম্য হয় না, এটা বোঝেন না বলেই প্রমাণিত হয় যে সোমেন ঠাকুরের মস্তিষ্কেও কোনো ভারসাম্য নাই। চাষাভুষোরা যে তাকে পাগল বলে তা আরেকবার ঠাকুরবাড়িতেও প্রমাণ করলেন তিনি

মিষ্টি তিনি খাননি। আলুর দম আর লুচি খেয়েই উঠলেন। ...এই প্রথম। এই শেষ। তার আর কোনো হাসি আমি শুনিনি। হয়ত আমার সামনে হাসলেও তার কবিত্বের কোনো ক্ষতি হতো। তাই

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। ছয় নম্বর গ্লাসটাও শেষের পথে। একটা বাদামের দানা খুঁটতে খুঁটতে বলল– আমি চেষ্টা করেছিলাম। করেছি। তার কয়েকটা কবিতার অনুলেখনও করে দিয়েছি আমি। আমার ভালো লাগতো। ...তার বিদায় অভিশাপ কবিতাটা আমার অনুলেখন। তিনি বলে গেছেন আর আমি ঠোঁট দিয়ে কলম কামড়ে ধরে লিখে গেছি লাইনের পর লাইন। তিনি কচের সংলাপগুলো চোখ বন্ধ করে আর দেবযানীর সংলাপগুলো আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলে যাচ্ছিলেন। ...জানিস তখন আমার মনে হচ্ছিল তিনি আমাকে দেখেই দেবযানীকে তৈরি করছেন। ...কিন্তু না। তিনি কাউকে দেখে লেখেন না কিছুই। নিজের ভেতরেই তিনি একটা নারী সত্তা পোষেন। সেই নারীকেই তিনি কখনো দেবযানী- কখনো গান্ধারী আর কখনো কুন্তী কিংবা চিত্রাঙ্গদা সাজান। অন্য কাউকে দেখতে পেলেও অন্তত আমাকে দেখেন না তিনি। তিনি যখন আমার পাশে বসে কচের সংলাপ বলেন তখন চোখ বন্ধ করে থাকেন। সেই বন্ধ করা চোখে তিনি সমগ্র বিশ্ব দেখতে পান শুধু আমাকে ছাড়া। আমি তার কাছে শুধুই পারিবারিক ছবি তোলা কিংবা তার জীবনীর নির্ধারিত ছকে বসার জন্য একটা বিয়ে করা বৌ। একটা স্ত্রী

শেষ ঢোঁকটা সে গলায় ঢালল। আমিও শেষ করলাম। আমার দিকে তাকাল– তোকে আরেকটা থ্যাংকস। তোদের কবির কবিতার বাইরে এসে তুই আমাকে সুন্দর বলেছিস। তিনিতো দেখেননি আমাকে। আর তোরাতো তোদের কবির না দেখা কোনো বিষয়কে দেখার কথা ভাবাকেই পাপ মনে করিস। ...আমি কিন্তু আজ লালপেড়ে সবুজ শাড়ির সঙ্গে কপালে লাল টিপও পরেছি। যেটা তুই পছন্দ করিস। কিন্তু আজ সে দিকে তুই তাকিয়েও দেখিসনি
২০০৫.০২.০৫

অন্তর্যান

রেল সড়ক থেকে রাস্তাটা নিচে নেমে গেছে বাম পাশে ধানের জমি আর ডানে গ্রামের মাঝখান দিয়ে। কাদামাখা পিচ্ছিল পথ। মানুষ নামার পথে বর্ষার পানিও নামে। এটাই নিয়ম পায়ের সাথে পানির। রেল সড়কের পেটে অনেকটা নালার মতো হয়ে তা মিশে গেছে গ্রামের সেই পথটাতে। চিনতে অসুবিধা হবার কথা নয়। জীবনে যে কমপক্ষে তিনবার এখানে এসেছে তার কাছ থেকে শোনা বর্ণনা

নেমে গেলাম। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার দরকার নেই এখনো। হাঁটা শুরু করলাম। যাদের কোনো তাড়া নেই এবং যারা শিশু, বাড়ির আশেপাশে দৌড়াদৌড়ি করছে তারাই শুধু দ্বিতীয়বার আমার দিকে ফিরে তাকাল। হাতে একটা বাঁশের কঞ্চি– শরীরের উপরের অংশ খোলা এমন একটি ছ-সাত বছরের ছেলে মুখে আঙুল ঢুকিয়ে কঞ্চিধরা হাতটি মাজায় ঠেকিয়ে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে তার থেকে কম বয়েসি একটাকে বলল– দেখ দেখ লোকটা চশমা দিয়ে তাকায় না। তাকায় চশমার ফাঁক দিয়ে। হিঃ হিঃ হিঃ

প্রথম তিন পথের মুখে পৌঁছে ইচ্ছে হলো একটু যাচাই করে নেই পথ ঠিক আছে কি না
– ভাই নলীডোবা বাজারের পথ কোনটা?
– এই দিকে

লোকটা বামের রাস্তা দেখিয়ে চলে গেলো কাঁধে বাঁক আর খালি শিকা ঝুলিয়ে। রাস্তাটি বেড়ি বাঁধের। একটু বেশি পিচ্ছিল মাটির। বাম পাশে গ্রাম আর ধান ক্ষেত মিশে আছে। ডানে নদীর পাড়। কিছু অস্থায়ী দোকান মাঝেমাঝে। মাঝেমাঝে কিছু লাউর মাচান। যেখানে রাস্তার উপরে এসে নুয়ে গেছে গৃহস্থ বাড়ির বাঁশঝাড় কিংবা গাছ, সেখানে চপচপ কাদা। দেখে দেখে পা ফেলার জায়গা খুঁজে বের করতে হয়

গ্রাম শেষ হয়ে গেলো এক সময়। বাঁয়ে লাগাতার ধানী জমি আর ডানে বাঁধের পাড় বেয়ে নেমে যাওয়া বর্ষার নদী। রোদ হালকা হতে হতে এসে অন্য গ্রামে মিশে গেলো পথটা। গ্রামটার শুরু এক বাজার দিয়ে। গরু আর মাছের বাজার। এখানে অন্য কিছু পাওয়া যায় না। পথের বাম পাশের ধানের জমিতে নদীর মাটি তুলে উঁচু ভিটেতে তৈরি বাজারটি। চারপাশে পাকা দেয়াল। উপরে টিন। গরু আর মাছ এখানে একসাথে বিক্রি হয় একই ঘরের ভেতর। এই বাজার-ঘরটি ছাড়া ডান পাশে কয়েকটা চায়ের দোকান মাত্র। দুটো দরজা বাজার-ঘরের। একটি মাছ আর গরু বিক্রি করতে আনার জন্য। অন্যটি গরু আর মাছ কেনার জন্য। খালি হাতে মানুষের যাওয়া আসা দুদিকেই চলে। গ্রামের নাম গোলাভাঙা আর বাজারটিকে সবাই গোলামুখী বাজার নামে ডাকে। গোলামুখী বাজারে গরু আর মাছ কিনতে আসে অন্য গ্রাম আর শহরের মানুষ। কিন্তু বিক্রি করতে পারে শুধু গোলাভাঙা মানুষেরাই। বাজার ঘরের বেরোবার দরজাটি পথের সাথে। ঢোকার পথটি পেছনে

বাজার ঘরের দরজার সামনে একটা লোককে দেখে চিনলাম। তার কোমর থেকে উপরে টাইশুদ্ধ নাগরিক পোশাক। নিচে লুঙ্গি আর খালি পা। পায়ের আঙুলের ফাঁকে চপচপ করছে কাদা। কাঠের বাটওয়ালা ছাতা হাতে লোকটি বের হয়ে যাচ্ছিল মাছ কিংবা গরু ছাড়াই
– আপনার পতাকা কই?

ছাতা ধরা হাতের মুঠো থেকে রুমাল বের করে লোকটা দেখাল। জাতীয় পতাকা। লোকটি শহরে গাড়ি হাঁকিয়ে যখন যায় তখন এই পতাকাটি তার গাড়িতে দেখে সবাই তাকে মন্ত্রী হিসেবে চেনে

– কিছু কিনলেন না?
– গরু কিনতে এসছিলাম। পছন্দ হয়নি। এখন উজানঘাটে যাব ভাবছি
– সে তো অনেক দূর
– আর কোনো উপায় তো নেই
এক হাতে লুঙ্গির খুঁট ধরে লোকটি হাঁটতে শুরু করল আমার ফেলে আসা পথে

গোলামুখী পার হতেই হঠাৎ করে পুরো সড়ক জুড়ে গরু আর মানুষের মিছিল আসতে লাগল আমার দিকে। মাঝেমাঝে কেউ খাঁচা ভরা মাছ নিয়ে তেড়ে আসছে। একমাত্র আমিই যাচ্ছি উল্টো দিকে। বাকিরা যাচ্ছে বাজার ধরতে

গোলাভাঙা শেষ হতে হতে কিছু পাহাড়ি লক্ষ্মণ চোখে পড়া শুরু হলো। এপাশে গরু চরানো আর খড়ি খোঁজা ছাড়া কেউ আসে না খুব একটা। শুধু নলীডোবা বাজারের মানুষেরা এই রাস্তা পার হয়ে যায়। গ্রাম ছেড়ে দ্বিতীয় তেপথে এসে দাঁড়ালাম। নাক বরাবর যে পথ সেটি সোজা পাহাড়ের উপর দিয়ে চলে গেছে। বাম পাশেরটি চলে গেছে পাহাড়ের পেট বেয়ে আর ডানেরটি গেছে একপাশে ধানক্ষেত আর আরেকপাশে গ্রাম রেখে। তিনটি পথেই নলীডোবা যাওয়া যায়। তিনটি পথই বিপজ্জনক। মাঝেমাঝে কোনো একটি পথ কিছুটা নিরাপদ হয়। এই সংবাদটি আমাকে এখান থেকেই জেনে নিতে হবে

লোকজন নেই। জিজ্ঞেস করার উপায়ও নেই। মনে হলো ডানেরটা বেশি ঘুরপথ হবে। সোজা পথটাকে ভাবলাম ভালো নয়। বামে যাওয়াই ভালো। গোলাভাঙা গ্রামের পথ ছেড়ে বামে নিচে নেমে গেলাম। অন্যখানে যে রকম জমিকে ধানক্ষেত বলে সে রকম জমি এখানে অনাবাদি। পাড়ে সার সার বেত ঝোপ। তার নিচ দিয়ে পথ। শুরুতেই পথের উপরে নুয়ে আসা বেতের পাতায় ধাক্কা লেগে ডান কানের লতিতে একটা বেত কাঁটা ঢুকে গেলো। ছাড়িয়ে এগোতে থাকলাম। মাথা নিচু করে বেত কাঁটা বাঁচিয়ে একটু এগোতেই ডান পাশে গোলমতো বেশ বড়ো একটা ফাঁকা জায়গা। বামে সেই ঢালু জমি। সামনে পাহাড়ের পেটে রেল লাইনের টানেল। পত্রিকায় দেখেছি পাহাড়ের ভেতর দিয়ে রেল লাইন বিপজ্জনক বলে এখানে পুরো রেলপথটাকেই টানেলের ভেতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কাজ শেষ হয়নি। স্বচ্ছ কাচের টানেল চলে গেছে পাহাড়রে পেট বেয়ে। কিন্তু তার সাথে সাথে বন্ধ করে দিয়েছে এদিক থেকে পাহাড়ে ওঠার পথ। বাম দিকের পথটা মিশে গেছে ডোবা জমিতে গিয়ে। আর ডান পাশটা মূলত পাহাড়েরই বর্ধিত অংশ, ঝোপঝাড়সহ বৃত্তাকারে ঘুরে এসে আমাকে ঘেরাও করে রেখেছে এখানে

কোনো পথ নেই বের হবার। জিজ্ঞেস করার মতোও নেই কেউ। হঠাৎ ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে দেখলাম ডানপাশের বৃত্তাকার জঙ্গলের ওপাশে একটা ঘরের মতো কিছু দেখা যায়। দুয়েকজন মানুষের নড়াচড়াও যেন আছে। হয়ত ওখানে গেলে পথ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেখানে যেতে হলে যে পথ দিয়ে এসছি আমাকে আবার সে পথেই ফিরে যেতে হবে। কী আর করা। ফিরতি পথ ধরলাম গোলাভাঙা গ্রামের দিকে। গোলাভাঙা তেমাথায় এসে দেখলাম এখান থেকে বাড়িটা দেখা যায় না। মনে হয় সামনের পুরোটাই জঙ্গল– মিশে গেছে পাহাড়ে। কিন্তু ভালো করে তাকালে ছোট্ট একটা পায়ে হাঁটা পথ দেখা যায় ঝোপের ভেতর দিয়ে। এগোলাম। বাহ্ এখানেও আরেকটা বনের বৃত্ত। বৃত্তের ভেতরে চমৎকার এক উঠান। উঠানের বাউন্ডারি দিয়ে রেখেছে বেতবন। না জানলে বাইরে থেকে কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় এখানে কিছু আছে। উঠানের উল্টো পাশে পাহাড়ের পেটে লাগানো সেই বাড়িটা। উঠান থেকে শুরু হয়ে শেষ হয়েছে একেবারে পাহাড়ে গিয়ে। বাড়িটা একটা চায়ের দোকান। দোকানবাড়িটা দালান দিয়ে শুরু হয়ে শেষ হয়েছে কুঁড়ে ঘরে। দালান অংশটা ডুপ্লেক্স। চমৎকার বারান্দা উপরে। কেউ থাকে বলে মনে হয় না। ডুপ্লেক্স থেকে বাড়িটা নেমে এসেছে একতলা দালানে। অবশ্যই সংযুক্ত। এরপর টিনের চালে ইটের দেয়াল। তারই সাথে লাগানো খড়ের চালের মাটির ঘর। চাল আর দেয়াল আলাদা আলাদা কিন্তু উঁচু দাওয়ার উপর সবগুলো ঘরের লাগাতার বারান্দাটি মাটির। এক বারান্দা। বারান্দাতেই চায়ের চুলা। উঠানে ছড়ানো বেঞ্চ। সবাই চুলার কাছে উঠে এসে চায়ের কাপ নিয়ে যায় আবার শেষ করে টিনের ঘরের সামনে রেখে আসে। ওখানে কাপগুলো ধোয়া মোছা হয়

নলীডোবা থেকে যারা বাইরে আসে অথবা যারা বাইরে থেকে নলীডোবা যায় সবাই যাওয়া আসার মাঝখানে এখানে চা খেয়ে নলীডোবা যাওয়া কিংবা ছেড়ে যাওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে

– ভাই নলীডোবা যাবার রাস্তা কোনটা?

যে লোক চা বানাচ্ছিল তাকে জিজ্ঞেস করলাম

– চায়ে চিনি বেশি হবে না কম হবে?

লোকটা আমার দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করল

– আমি নলীডোবা যাবার রাস্তাটা জানতে চাইছি

– দুধ-চা হবে নাকি লাল-চা?

লোকটা কি কানে শোনে না নাকি? আমি আবার জিজ্ঞেস করতে যাব এমন সময় একজন চায়ের কাপ রাখতে এসে আমার কাছে দাঁড়িয়ে গেলো– আগে চা খান তার পরে সব হবে

– আমি নলীডোবা যাব

– এখানে যারা আছে তারা সবাই হয় নলীডোবা যাবে না হয় নলীডোবা থেকে আসছে। আপনি আগে চা খান

– চা খাব কিন্তু...

– চা না খেয়ে এখানে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে না

– লিকার কড়াই দিলাম। দেখে মনে হচ্ছে আপনি কড়া চা খান। দুধ-চিনি মাঝারি। লাগলে নিয়ে নেবেন উঠানের ওই পাশে গামলায় আছে

দোকানি বিশাল মগে আমার সামনে চা এগিয়ে দিতে দিতে বলল

– ঠিকই আছে। আমি এরকমই চা খাই। আমার জন্ম চা বাগানে

– দেখেই বুঝেছি। আপনার চোখে চা পাতার কষ লেগে আছে। শরীর থেকেও চায়ের গন্ধ পাচ্ছি। আমার চা পাতাও বাগান থেকে তোলা। তবে এগুলো জংলি চা পাতা

– কোন বাগান?

– রাজার বাগিচা। পেছনে যে পাহাড়টা দেখছেন ওটাই। এক সময় এ-ক্লাস বাগান ছিল। কিন্তু এখন জঙ্গল। মালিক নেই। চা গাছগুলো বাড়তে বাড়তে বটগাছের মতো হয়ে গেছে। শুধু আমিই কিছু পাতা তুলে আনি। বাকিটা জঙ্গল

– কত আপনার?

চায়ের মগটা জায়গায় রেখে আমি দাম জিজ্ঞেস করলাম

– আপনি নলীডোবা কেন যাবেন?

– বলছি। চায়ের দামটা কত বলেন

– আপনি আগে গেছেন কখনো?

দোকানি তার প্রশ্ন করতেই থাকল

– চায়ের দাম কত?

– এখানে চায়ের দাম দিতে হয় না

আগের সেই লোকটা এগিয়ে এসে বলল– আপনি নলীডোবা যাচ্ছেন। ফেরার পথে যে কোনো একটা কিছু এখানে রেখে যাবেন

– আমি আর কতজনকে বলি। একা মানুষ। কত সাংবাদিককে বললাম আমার কথাগুলো কাগজে লিখে দিতে। কত প্রেসের লোককে বললাম একটা পোস্টার ছাপিয়ে দিতে। ডেকোরেটারের কতজনকে বললাম শহরে মাইকিং করে দিতে, আমি কিছু নেই না। আমি চা বানাই শখে। যারা শহর থেকে নলীডোবা যায় তারা এখানে বসে ঠিকানা নিয়ে যায়। আর যারা নলীডোবা থেকে শহরে যায় তারাও বসে। শহরের হরতাল– নতুন সিনেমা– নায়িকাদের সংসার ভাঙার খবর– বাজারদর সব তারা এখান থেকেই পেয়ে যায়। তাদের জন্য একটুখানি গরম পানিতে চায়ের পাতা

ঢেলে আমি নেড়ে দেই। পাতা আমার কিনতে হয় না। রাজার বাগিচার পাতা। মাঝেমাঝে কিছু তুলে কোনো বাগানের ট্রাক্টরে দিয়ে দেই। তারা ফ্যাক্টরিতে নিয়ে পাতা বানিয়ে এসে দিয়ে যায় যখন তাদের কেউ নলীডোবা যায়। আর এই এলাকার গোয়ালারা নিজেরাই খুশি হয়ে দুধ দিয়ে যায় প্রতিদিন। কিন্তু কেউই কোনো কাজ করে না। সেই যেইসেই। শহর থেকে যারা আসে তারা প্রত্যেকেই জিজ্ঞেস করে চায়ের দাম কত। কী আর করব? তাই এখন এ সম্পর্কে কথা বলাই বন্ধ করে দিয়েছি। কারো ইচ্ছে হলে আমার হয়ে বলে, না হয় যে জিজ্ঞেস করে সে ধরে নেয় আমি কানে শুনি না

বলতে বলতে দোকানি তার কাজ করে যাচ্ছিল– আপনি নলীডোবায় কী কিনতে যাবেন?

– কুমারী মায়ের ফুল দিয়ে বানানো হাওয়ার মিঠাই

– কষ্ট হবে খাঁটি জিনিস পাওয়া। এখন আবার পাইকাররা এক মা'কেই তিনবার কুমারী মা বানায় নিজেরা বিয়ে করে। পাবেন না যে তা নয়। দেখে নিতে হবে একটু

– চিনব কী করে?

– তেমন অসুবিধা নেই। যে মিঠাইটা আপনি দাম করার পর তিন চারজন সুপারিশ করবে ভালো বলে। ধরে নেবেন ওটাতে ভেজাল আছে। আর যে জিনিসটা দাম করার সাথে সাথে পুলিশ এসে আপনাকে জেরা করবে, ধরে নেবেন আপনি ঠিক জিনিসের সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন

– পুলিশ সমস্যা করে নাকি?

– তেমন কিছু না। তবে সরকার তাদেরকে জুতো কেনার টাকা দেয় না। তারা পোশাকের সাথে নাগরা পরে ঘুরে বেড়ায়। রাবারের নাগরা। ফলে সারাদিনই তাদের মাথা গরম থাকে। মাথা ঠান্ডা করার জন্য ওরা মাঝেমাঝে কপালে টাকার পট্টি লাগায়

– নলীডোবা মানে জানেন?

সেই লোকটি আরেক কাপ চা নিতে নিতে বলল

– না

– নলী মানে ডগা বা মাথা। একবার বন্যায় এ অঞ্চলে সুপারি গাছের নলী পর্যন্ত ডুবে গিয়েছিল। বন্যায় অনেক কিছু ভাসিয়ে যেমন নিয়ে গেছে তেমনি অনেক কিছুই ভাসিয়ে এনে বিভিন্ন গাছের ডগায় আটকে দিয়ে গেছে। সেই বন্যা নেমে যাবার পর দেখা গেলো আজকের নলীডোবা বাজারের উপর, তখন সেটা বাজার ছিল না, ছিল মাঠ, সেই মাঠের উপর অনেকগুলো ঘরবাড়ি ফেলে দিয়ে গেছে। পরে সেই ঘরবাড়িগুলোকে ঠিকঠাক করেই তৈরি করা হয় আজকের নলীডোবা বাজার

– বাজারে যাবার পথটা কোন দিকে?

– আপনি যে দিক থেকে ফিরে এসছেন সেদিকেই। রেল টানেলের নিচ দিয়ে একটা চোরা পথ আছে। অসুবিধা নেই। আমিও যাব। ...আপনার সাথে কোনো হাতিয়ার নেই?

– না তো

– হাতিয়ার লাগবে। বনের পথে হাঁটতে হলে অনেক ক্ষেত্রেই বন কেটে কেটে হাঁটতে হয়। তাছাড়া জন্তু জানোয়ারের ভয়তো আছেই। আপনি এখান থেকে একটা খাসিয়া দাও নিয়ে নিতে পারেন। খাসিয়া দাও হাতে দেখলে পুলিশরা আপনাকে ঘাঁটাবে না

– নলীডোবা কে কে যাবে?

একটা লোক এক কোনায় দাঁড়িয়ে চিৎকার দিলো– আমি রওয়ানা দিচ্ছি

– নেন কাজে লাগবে

দোকানি আমার হাতে একটা খাসিয়া দাও ধরিয়ে দিলো– ওদের সাথে চলে যান। চোখ বন্ধ করে যেতে পারবেন

আমি একেবারেই পেছনে। মোট সাতজন। এটাকে যে রাস্তা বলে কিংবা এখানে যে মানুষ চলাচলের রাস্তাও থাকতে পারে কেউ নিজে না গেলে বিশ্বাস করা কঠিন। সবাই হাঁটছে প্রায় চুপচাপ

– তা আপনি কি মনে করেন যা নিতে যাচ্ছেন তা পাবেন নলীডোবায়?
সবচে সামনের লোকটা আস্তে আস্তে পেছনে আসতে আসতে আমার কাছাকাছি এসে নিচু গলায় কথাটা বলল
– অন্য কোথাওতো সে সম্ভাবনাও নেই
– আহ্ অত জোরে কথা বলে না। পাহাড় এখন বিশ্রাম নিচ্ছে। জোরে কথা বললে বিরক্ত হবে। কিন্তু যদি না পান?
– ফিরে আসব
আমিও তার মতো প্রায় ফিসফিস করে বললাম
– আপনি পেতেও পারেন
– কী রকম?
– আপনি একটা তক্তার মতো রসকষহীন মানুষ
– মানে?
– যেখানে কেউ এমনি এমনি যায় না। সেখানে যাচ্ছেন অথচ কী সহজে বললেন না পেলে ফিরে আসবেন
– এ ছাড়া আর কী করা?
– পাহাড় লোভী মানুষকে পছন্দ করে না। নিরিবিলি মানুষ তার খুব পছন্দ। লোভী মানুষেরা জোরে কথা বলে পাহাড়ের আড়াল ভেঙে দেয়। এ জন্যই পাহাড় বন্যা এনে সবাইকে তাড়িয়ে আবার নিজের মতো সাজিয়ে নিয়েছে নিজেকে

আস্তে আস্তে লোকজন কমতে থাকল। বাজার পর্যন্ত যাবে না কেউই। এরা নলীডোবার লোক। গিয়েছিল শহরে। বাড়ি ফিরছে। যার বাড়ি যেখানে সে সেখানেই বিদায় নিচ্ছে। সর্বশেষজন আমাকে বলল– ডানদিকে গিয়ে সোজা হাঁটলেই বাজার। বহুদূর থেকে মানুষজনের গমগম আওয়াজ শুনতে পাবেন। পুলিশের দিকে তাকাবেন না। সোজা মাছ বাজারের দিকে চলে যাবেন। তার পাশেই দেখবেন নিয়ে বসে আছে। থাকলে ওখানেই আছে। না থাকলে ফিরে চলে আসবেন। আর খোঁজার দরকার নেই। আসোল নকল চেনা না চেনা আপনার উপর

মাছ বাজারের শেষ মাথায় শুঁটকি বাজার, যা আবার মাছ বাজারে মাছুয়াদের ঢোকারও পথ। শুঁটকির গন্ধ আর মাছের পানি, মানুষের পায়ের কাদা, হাঁটতে হাঁটতে বারবার নিজের শরীরের গন্ধ পরীক্ষা করতে হলো আমাকে। ভাবলাম এখানে আসতে আসতে আমার শরীরে কোথাও পচন ধরেছে কি না

– বগলের গন্ধ কেন? পচা মানুষের গন্ধও শুঁটকি বাজারে পাবেন না। দেখেন না পোস্টমর্টেম শেষে পচা লাশ শুঁটকি দিয়ে মুড়িয়ে নিয়ে যায় গ্রামে?
লোকটা পেছন থেকে কথা বলল। বুঝলাম কোনো কারণে সে আমাকে ফলো করছে বেশ অনেকক্ষণ
– আমি হাবিলদার গজম্বর আলী। বহু বছর পুলিশে আছি। আজ পোশাকটা ধুয়ে দিয়েছি তাই সিভিল পোশাকেই আসতে হলো। অবশ্য আমার ফোর্সের বাকিদের পোশাক পরাই আছে। আমরা প্রতিদিন একজন করে পোশাক ধুয়ে দেই। একটাই পোশাকতো আমাদের? প্রতি পনেরো বছর পরপর আমাদেরকে এক সেট করে পোশাক দেয়া হয়। আমারটার বয়স চলছে তেরো বছর। আরো দুই বছর পর আমার নতুন পোশাক পাওয়ার কথা। অবশ্য দেড় বছরের মাথায় আমার রিটায়ারমেন্ট হয়ে যাবে

একটানে কথাগুলো বলে গজম্বর আলী থামল শ্বাস নেয়ার জন্য
– এক সেট পোশাক অত দিন পরেন কীভাবে?
– সব একসাথে পরি না তো। একটা একটা করে পরি। কোনো দিন শুধু প্যান্ট পরি। কোনো দিন শার্ট। কোনো দিন বেল্ট কিংবা টুপি। মাঝেমাঝে শুধু ব্যাজটাকেও পরি। যেদিন ঝড়-বৃষ্টি হয় সেদিন। পিতলের ব্যাজ বৃষ্টিতে কিছু হয় না। অবশ্য সবগুলোকেই আমরা ফুল ইউনিফর্ম বলি। এই বাজারে আমার পরনে কিছু না থাকলেও অবশ্য সবাই আমাকে হাবিলদার আর সরকারি লোক বলে চেনে। আমার অসুবিধা হয় না। আর নতুন কোনো লোক এলে নিজেই পরিচয়টা দিয়ে দেই। আগে থেকে পরিচয় দেয়া সুন্নত। নবীজী যে কোনো নতুন মানুষ দেখলে সালাম করে নিজের

পরিচয় দিয়ে কুশল জিজ্ঞেস করতেন। অবশ্য সালাম দেয়ার অভ্যাসটা তৈরি হয়নি আমার। পুলিশে চাকরি করি বলে আমাদের দেখলে সবাই আগে সালাম দিয়ে দেয়। কাউকে সালাম দেবার সুযোগ হয় না আমাদের। উত্তর দিতে দিতেই মুখে ব্যথা করে। তবে পরিচয়টা দেই। একটা দায়িত্ব আছেতো। কী বলেন? আফটার অল সরকারি দায়িত্বে আছি, এবং দায়িত্বটা হলো জনগণকে সাহায্য করা। আমাকে যদি কেউ চিনতেই না পারে তবে আমার সাহায্য নেবে কী করে? কথাটা ঠিক কি না? কী বলেন আপনি?

গজম্বর আলী বলেই চলেছে– আমি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছি আপনি এখানে নতুন। না হলে আমাকে অন্তত একটা সালাম দিতেন। অসুবিধা নেই। সালাম দিলে সওয়াব হয়, না দিলে কোনো গুনা হয় না। কিন্তু সালামের উত্তর না দিলে গুনা হয়। উত্তর দেয়া ওয়াজিব

হাঁটতে হাঁটতে শুঁটকি বাজার প্রায় ফেলে চলে এলাম। গজম্বর আলী কথা বলতে বলতে আমার পেছন পেছন আসছে – বয়স হয়ে গেছে, আগের মতো আর জোরে হাঁটতে পারি না। এক সময় দৌড়ে ঘোড়সওয়ার ডাকাতকে পর্যন্ত ধরে ফেলেছি। এখন আর পারি না। একবার আমার অলিম্পিকে দৌড়ানোর কথা ছিল। কিন্তু দেশে চোর ডাকাত বেড়ে যাওয়ায় আমাকে আর যেতে দেয়া হয়নি। বিদেশে ফাঁকা মাঠে দৌড়ে মেডেল জেতার চেয়ে দেশে একটা চোর ধরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কথাটা ঠিক কি না? কী বলেন আপনি? সে জন্য আর গেলাম না। না হলে আমার পোশাকের সাথে কমসে কম দুটো সোনার মেডেল থাকত আজ। একটু আস্তে হাঁটেন। অবশ্য আমার ফোর্সে একটা ছেলে আছে, দুই বছর হয় জয়েন করেছে। সে আপনার সাথে হেঁটে পারবে। জোয়ান ছেলে। হাঁটে ভালো। কিন্তু আমার মতো না। আমি আরো ভালো হাঁটতে পারতাম

ভিড়ের মধ্যে আমি যে খুব একটা জোরে হাঁটছি তা নয়। তবু গজম্বর আলী প্রায় দৌড়াচ্ছে আমার পেছনে– আপনাকে দেখেই বুঝেছি আপনি শুঁটকি পাইকার নন। এখানে শুঁটকি কিনতে আসেননি। আপনি ফুল মিঠাই কিনতে এসেছেন
– ফুল মিঠাই?
– মেয়েদের ফুল দিয়ে তৈরি হাওয়ার মিঠাই। সংক্ষেপে সবাই ফুল মিঠাই বলে
– কী করে বুঝলেন?
– বুঝি বুঝি। মানুষকে বোঝাই আমাদের পেশা। বহু বছর থেকে আছি এই পেশায়। আমার সাথের অনেকে কনস্টেবল থেকেই রিটায়ার করেছে। আর আমি তিন তিনটা প্রমোশন পেয়েছি। এসবতো আর এমনি এমনি হয়নি। হয়েছে আমার যোগ্যতায়। কথাটা ঠিক কি না? কী বলেন আপনি?

ভালো করে তাকালাম লোকটার দিকে। গজম্বর আলীর এক চোখ নেই। অন্য চোখটা প্রায় গর্তের ভেতরে। সে আমাকে অতক্ষণ ফলো না করলে আমি বিশ্বাসই করতাম না যে সে তার অন্য চোখটা দিয়ে দেখতে পায়। তাল-ঢ্যাঙ্গা শরীর। কথা বললে সামনের একটা দাঁত নড়বড় করে। আশপাশের বাকিগুলো আগেই পড়ে গেছে
– আসেন আমার সাথে। একমাত্র আমিই আপনাকে খাঁটি জিনিসটা দেখিয়ে দিতে পারব

শুঁটকি বাজার পার হয়ে চলে এসছি। এখানে পরপর কয়েকটা চায়ের দোকান। তারপর লাগোয়া অনেকগুলো ঘর। দরজা বন্ধ। আমি নিশ্চিত এটিই সেই জায়গা। কিন্তু গজম্বর আলী আমাকে যেভাবে পেঁচিয়ে ধরেছে, তাকে এড়ানো কঠিন মনে হলো

– আসেন আমার ফোর্সের সাথে পরিচয় করিয়ে দেই। ওরা তাহলে আপনাকে যে কোনো সময় সাহায্য করতে পারবে। টাউট বাটপারেরতো অভাব নেই। বলা যায় না কখন কী ঘটে। আসেন
আমি একটু হেসিটেট করছি দেখে গজম্বর আলী আবার মুখ খুলল– আরে আসেন। ফোর্সের সাথে অতিথির পরিচয় করানোটাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বলে গার্ড অব অনার। গার্ডরা যাতে অতিথির মুখ চিনে রাখতে পারে সেজন্য কোনো

রাষ্ট্রীয় অতিথি এলে তাকে গার্ডদের সামনে দিয়ে হাঁটিয়ে নেয়া হয়। অবশ্য সেরকম কিছু হবে না আপনার বেলায়। আপনিতো আর রাষ্ট্রীয় অতিথি নন। তাছাড়া আপনি এসেছেন এমন একটা কাজে যেটার আবার সাংবিধানিক স্বীকৃতি নেই। আমাদের ভাষায় যাকে আমরা বলি বেআইনি কাজ

গজম্বর আলী আমাকে ছাড়বে না। তার সাথে যেতেই হবে। আশপাশটা দেখে নিলাম। লোকজন কোনো কোনো জায়গায় জটলা করে আছে। আমাকে দেখছে। কিন্তু কেউই এগিয়ে আসছে না। বুঝলাম এর কারণ গজম্বর আলী। একটা বেড়ার সাথে হেলান দিয়ে মুখে একটা পাতা আলতোভাবে চিবোতে চিবোতে একটা মেয়ে আমাদের দেখছিল। মেয়েটা কিশোরী। তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টে। গজম্বর আলী আবার ডাক দিলো। তার সাথে চললাম
– এই যে এরা আমার ফোর্সের লোক

কারো পরনে সরকারি শার্টের সাথে স্থানীয় লুঙ্গি। কারো পরনে স্যান্ডো গেঞ্জির সাথে সরকারি প্যান্ট। কেউ শুধু ব্যাজ পরে আছে। গজম্বর আলী সাথে না থাকলে আমি নির্ঘাত এদের শুঁটকি পাইকার বা অন্য কিছু ধরে নিতাম। কোনোভাবেই পুলিশের লোক নয়। কিন্তু গজম্বর আলীসহ সবার পায়েই রাবারের নাগরা। তারা যে এক দলের লোক এটাই এখানে তাদের চেনার একমাত্র ইউনিফর্ম

– লম্বু মিয়া। আজকেতো ঝড় বৃষ্টি নেই। আজ তুমি ব্যাজ পরে এসেছ কেন?
শুধু ব্যাজ পরে আসা তাগড়া জোয়ান একটাকে লক্ষ্য করে কথাগুলো বলল গজম্বর আলী
– আজকে ওস্তাদ প্যান্ট পরেই আসছিলাম। কিন্তু রাস্তায় একজনের গাই ছুটে গেলো। আমাকে বলল ধরতে। আমি দৌড়ে গিয়ে ধরলাম গরুটার লেজে। আর তখন সে পেশাব করে আমার প্যান্টটা নষ্ট করে দিলো ওস্তাদ
– গরুটা ধরে দিতে পেরেছ মালিককে?
– জ্বি ওস্তাদ
– যাক একটা সরকারি কাজ করেছ বলে তোমাকে আজ ক্ষমা করে দিলাম। পরিচয় করিয়ে দেই। ইনি আমার পরিচিত লোক। শহরে থাকেন। এখানে এসেছেন একটা ফুল মিঠাই নিতে। গবেষণা করবেন তিনি। তিনি ব্যবসা করেন না। ছাত্র মানুষ। আমাদের উচিত তাকে সাহায্য করা। কথাটা ঠিক কি না? কী বলো তোমরা?

যেখানে গজম্বর আলী আমাকে নিয়ে এল সেটা একটা চায়ের ছাপড়া দোকান। কোনো দিকে কোনো বেড়া নেই। বাঁশের খুঁটির উপর সুপারি গাছের টুকরো বসিয়ে কয়েকটা বেঞ্চ বানানো চারপাশে। মাথার উপরে খড়ের চাল। খেয়াল করে দেখলাম সেই মেয়েটা একইভাবে পাতা চিবোতে চিবোতে এইবার চায়ের দোকান থেকে বেশ দূরে আমার মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছে। পাতাটি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। ওর দিকে আমার চোখ যেতেই মনে হলো হাতের পাতা নেড়ে কিছু একটা নিষেধ করছে আমাকে
– আমরা চা খাই কী বলেন? অনেকদূর থেকে আসছেন। চা খেলে শরীর চাঙ্গা হবে। তারপরে আমি আপনাকে নিয়ে যাব। কথাটা ঠিক কি না? কী বলেন আপনি?

গজম্বর আলীর কথার মাঝখানে তাকে লুকিয়ে আবার তাকালাম মেয়েটির দিকে। এবার সে স্পষ্ট মাথা নেড়ে আমাকে কী যেন নিষেধ করে হাতের পাতাটি তার ডান দিকে ছুঁড়ে ফেলল। আবার তা তুলে যে জায়গায় পাতাটি পড়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে বাম দিকে ছুঁড়ে দিলো। তারপর আবার পাতাটি ছুঁড়ল ডান দিকে। এবার পাতাটি যেখানে পড়ল সেখানেই মাটি আলগা করে পুঁতে দিলো
– চা খান। ঠান্ডা হলে চায়ের মজা থাকে না

দোকানি সবার জন্যই চা বানিয়েছে। মোট সাত কাপ। চা দিতেই গজম্বর আলী আর তার দল নিজেদের ইচ্ছেমতো বিস্কুট নিয়ে নিতে থাকল বয়াম থেকে– খালি খালি চা খাওয়া ঠিক না। পেটে গ্যাস হয়। নেন বিস্কুট চুবিয়ে খান
একটা টোস্ট বিস্কুট আমার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে কথাগুলো বলল গজম্বর আলী

চা খেতে খেতে আবার তাকালাম মেয়েটির দিকে। মেয়েটি আমাকে হাত দিয়ে ইশারা করে সে প্রথম যেদিকে পাতাটি ছুঁড়েছে সেদিকে এক দৌড়ে চলে গেলো

সরে যাবার পথ পাচ্ছি না। গজম্বর আলী আমাকে আটকে ফেলেছে– আচ্ছা আপনারাতো এখানে অনেকক্ষণ থাকবেন তাই না?

– আমরাতো সারা দিনরাত্রিই থাকি। অনেক দায়িত্ব না আমাদের? ভয় পাচ্ছেন? কোনো ভয় নেই। বাজারের সব লোক আপনার সাথে আমাকে কথা বলতে দেখেছে। কেউ কিছু করার সাহস পাবে না

– ভাবছিলাম যেহেতু গবেষণার কাজে এসেছি সেহেতু আমাকে বাজারের একটা বর্ণনাও দিতে হবে বইয়ের প্রথম পাতায়

– তাতো হবেই। আমাদের এসপি স্যার একবার জাপানে একটা ট্রেনিংয়ে গিয়েছিল। ফিরে এসে ওই ট্রেনিংয়ের উপর আশি পৃষ্ঠার একটা বই লেখে। আমাদের প্রত্যেকের বেতন থেকে একশো বিশ টাকা কেটে রেখে সে বইয়ের একটা করে কপি আমাদের সেলারির সাথে দেয়া হয়েছিল সেবার। স্যাররা বলেছে বইটা আমাদের জন্য খুব শিক্ষণীয় ছিল। সে বইয়ের প্রথম চল্লিশ পৃষ্ঠা জুড়ে টোকিও শহরের দর্শনীয় বস্তু– খেলার মাঠ– পার্ক আর মার্কেটের ছবি এবং কীভাবে কোথায় যাওয়া যাবে, ভাড়া কত লাগবে তার বর্ণনা। এছাড়া জাপানি মেয়েরা কেন আমাদের দেশের ছেলেদের পছন্দ করে তার উপর স্যারের একটা গবেষণাও আছে তাতে। ...অসুবিধা নেই আমি বলে দিচ্ছি আপনি লিখে নিন। আপনার সাথেতো ক্যামেরা নেই। ক্যামেরা থাকলে ভালো হতো। ছবি নিতে পারতেন। যেখানেই যান অ্যাটলিস্ট একটা ক্যামেরা সাথে করে নিয়ে যাওয়া উচিত। তাহলে অনেক কিছুই আর লিখে বর্ণনা করতে হবে না। বিশ পাতা লেখার চেয়ে একটা ছবি অনেক বেশি শক্তিশালী। কথাটা ঠিক কি না? কী বলেন আপনি? আমাদের এসপি স্যারকে দেখেছি সব সময়...

– আপনার কাছ থেকে বর্ণনা শুনতেই হবে আমাকে। তবে আমি ভাবছিলাম তার আগে নিজে একবার দেখে নেব

– অবশ্যই দেখবেন। কানে শোনার চেয়ে নিজের চোখে দেখা একশো গুণ বেশি শক্তিশালী। এজন্যই আমাদের ডিপার্টমেন্টে সুরতহাল রিপোর্টের উপর এত গুরুত্ব দেয়া হয়। সুরতহাল মানে হাল সময়ে সুরত। মানে বিষয়টা পুলিশ আসার সময় কী অবস্থায় আছে তার বর্ণনা। আপনি লম্বু মিয়াকে নিয়ে যান সাথে। যা যা দেখতে চান তাকে বলবেন সে দেখিয়ে দেবে। আরে আমরাতো আছিই এ জন্য। জনগণকে সাহায্য করার জন্য। কথাটা ঠিক কি না? কী বলেন আপনি?

– কিন্তু আমি ভাবছিলাম নিজে আবিষ্কার করে দেখার কথা। আপনি অভিজ্ঞ মানুষ। বিষয়টার মর্ম আপনি বুঝবেন। একটা রহস্য আবিষ্কারের মধ্যে আলাদা আনন্দ আছে

– তা ঠিক তা ঠিক। শুনেছি পর্যটকরা নতুন আবিষ্কারের নেশায় বাড়ি থেকে টাকা পয়সাও সঙ্গে নেয় না। এমনি এমনি বেরিয়ে পড়ে। একবার অবশ্য আমি ছোট বেলায় বাবার পকেট থেকে টাকা চুরি করে মামার বাড়ি চলে গিয়েছিলাম মাইরের ভয়ে। কিন্তু গিয়ে আবিষ্কার করলাম মামার বাড়িতে তালা। মামা তার শালির বিয়েতে চলে গেছে সবাইকে নিয়ে। পরে সেই টাকা খরচ করে বাড়িতে ফিরে এসে আবার সেই বাবার হাতেই মার খেতে হলো। হাঃ হাঃ হাঃ ছোটবেলার দুষ্টামি আরকি। এতে কোনো পাপ নেই। কথাটা ঠিক কি না? কী বলেন আপনি? হাঃ হাঃ হাঃ ...অসুবিধা নেই। আমরাতো এই বাজারেই আছি। দেখা হবেই। তাছাড়া কেউ কিছু বললে আমার নাম বলবেন। ...তবে মানুষের মন তো? বলা যায় না পরে হয়ত আমিও ভুলে যাব আর আপনি একজন গবেষক মানুষ। ভুলোমন। বিজ্ঞানী আইনস্টাইনও নাকি সবকিছু ভুলে থাকতে থাকতেই অত বড়ো হয়েছেন। এতে কোনো দোষ নেই। তিনি সবকিছু ভুলে গেলেও আমরা তাকে মনে রেখেছি। এটাই বা কম কিসে। আপনিও তার মতো... তার মতো না হলেও তারইতো জাতের লোক। গবেষক... তাই বলছিলাম কি লোকটা গরিব মানুষ। চা বিক্রি করেই সংসার চালায়। এখন পর্যন্ত চায়ের বিলটা দিয়ে দিলে ভালো হয়। পরেরটা পরে দিলেও চলবে

– একশো বাইশ টাকা

গজম্বর আলীর কথা শেষ হবার আগেই দোকানি বলল

– একশো বাইশ টাকা? সাতকাপ চা আর কয়েকটা বিস্কুট? এখানে চায়ের কাপ কত?

– আসোলে চায়ের দাম খুবই কম। শহরের কাছেতো দামই বলা চলে না
গজম্বর আলী বলল– ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা ফোর্সের লোকরা এখান থেকে নিয়মিত চা বিস্কুট খাই। আমরা জানি যারা সমাজের গণ্যমান্য মানুষ তারা ফোর্সের লোককে খাতির যত্ন করেন। খাওয়াতে চান। আফটার অল আমরা জনগণের জন্যইতো। কিন্তু অনেকেই সময়ের অভাবে আমাদেরকে খাওয়াতে পারেন না। তাই আমরা যখন নিজেরা নিজেরা খাই তখন আর টাকা দেই না। দোকানি লিখে রাখে। তারপর যেদিন কেউ এসে আমাদের চা খাওয়াতে চায় সেদিন সে একসাথে টাকাগুলো নিয়ে নেয়
– এই নিন
আমি একটা একশো টাকার নোট আর একটা পঞ্চাশ টাকার নোট দিলাম দোকানির হাতে
– এক কাজ করো, তুমি একশো ত্রিশ টাকা রেখে দাও
গজম্বর আলী দোকানিকে বলে আমার দিকে ফিরল– আপনার আসতে কমসে কম এক ঘণ্টা লাগবে। এর মধ্যে আমরা আরো দুয়েক কাপ চা তো খাবই। সে যদি পয়সা রেখে দেয় তাহলে একটু ভালো দুধ-চিনি দিয়ে আমাদের চা বানিয়ে দিতে পারবে। এখানে আবার টাকা বাকি থাকলে চায়ে বেশি চিনি দেবার নিয়ম নেই
– ভাংতি নেই। দশ টাকা আছে
– দশ টাকাই উনাকে দাও। বাকি টাকা থাকুক। আমরাতো বিস্কুটও খাব
এবার লম্বু মিয়া বলল দোকানিকে। দোকানি একটা পুরোপুরি ছেঁড়া দশ টাকার নোট আমার হাতে দিলো। আমি এর দিকে তাকাতেই বলল– আর নাই। থাকলে দিতাম। অসুবিধা নেই। আপনিতো আবার আমার দোকানে এসেই চা খাবেন। তখন বিল হিসেবে দিয়ে দিয়েন
– ঠিক আছে এখনই আগাম হিসেবে দিয়ে গেলাম। রাখেন ফিরে এসে খাব
আর কাউকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই বের হলাম– ফিরে আসার পর কিন্তু আপনাদের সবার সাহায্য আমার লাগবে
কথাটা বলতে বলতে বের হলাম। পেছনে গজম্বর আলী কী বলল পুরোপুরি শুনতে পেলাম না। শুধু শুনলাম যেন বেশি দেরি না করি

ডানে গিয়ে বামে। তারপর আবার ডানে। কিন্তু সবার আগে গজম্বর আলীদের চোখের আড়াল হতে হবে আমাকে। আমি বাম দিকে গেলাম। ঘন বাজার। মানুষজন আমাকে দেখছে কিন্তু গজম্বর আলীরা আমাকে দেখার কথা না। একটু ঘুরলাম। শুঁটকি দাম করালাম। গজম্বরদের কেউ আসছে না
– ভাইজান কি ফুল মিঠাই কিনতে এসছেন?
পেছন থেকে একটা লোক প্রশ্ন করল
– আমি শুঁটকির ব্যবসা করি
– ও আচ্ছা

তিনজনকে তিনটা মিথ্যে বলে। কয়েকজনকে ধাক্কা মেরে যখন পৌঁছালাম তখন মেয়েটা একটা কাপে করে ছাগীর দুধ দোয়াচ্ছে। আমার দিকে না তাকিয়েই বলল– তুমিতো চা খাও। আমাদের এখানে গরুর দুধ অন্য কাজে লাগায়। তাই তোমাকে ছাগলের দুধ দিয়েই চা খেতে হবে। দোকানে যে চা তোমাকে দিয়েছে ওটা কোনো দুধ নয়। বাজারের গুঁড়ো দুধের সাথে গরুর গায়ের গন্ধ মিশিয়ে ওরা গরুর দুধ বলে চালায়। এখানে বোতলের মধ্যে গরুর গায়ের গন্ধ কিনতে পাওয়া যায়। তবে চা পাতা দিয়ে তোমাকে চা খাওয়াতে পারব না আমি। এখানে চা খুব দামি আর চোরাবাজারে আসে। ফুল ব্যবসায়ীরা লুকিয়ে এনে চায়ের দোকানগুলোতে বিক্রি করে। আমরা পাই না। আমরা পাট শাকের পাতা শুকিয়ে তাতে চায়ের গন্ধ মাখাই। আর তামাক পাতা পিষে লিকার মাখাই চায়ে। ভালো লাগবে তোমার। তোমারতো আবার তামাক পাতার সাথে বহু দিনের বংশগত সম্পর্ক। তোমার অসুবিধা হবে না
– ডেকেছ কেন?
– ফুল মিঠাই কিনতে এসেছ তুমি
– তোমাকে কে বলেছে?

– মা আমাকে শিখিয়েছে মানুষের চোখ পড়তে। তোমার চোখের কোনার ঘূর্ণি দেখেই আমি বুঝে গেছি তুমি শুঁটকি কিংবা অন্য কিছু কিনতে আসনি অতদূর। তাছাড়া তুমি এখানে নতুন
– কী করে বুঝলে?
– এখানে যারা যাতায়াত করে তারা গজম্বর আলীদের সাথে মিশে না। বাজারে ঢোকার মুখে গজম্বর আলীদের হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে বাজারে ইচ্ছামতো ঘোরার অনুমতি নিয়ে নেয়। তুমি ওদের সাথে বসে চা খেয়েছ। এখানে কেউ তাদের সাথে বসে চা খায় না। চায়ের দোকানে গিয়ে ওদের খাওয়ার জন্য কিছু টাকা দিয়ে আসে। তারা বসে বসে চা খায় আর তখন ব্যবসায়ীরা শুঁটকির নিচে নকল ফুল লুকিয়ে ফেলে
– ফুল নকল হয় কী করে?
– চা না খেলে কি তোমার খুব অসুবিধা হবে?
– আমি কি বলেছি যে চা খাবো?
– কিন্তু তোমার জন্য আমাকে চা বানাতে হবে। এখানে অতিথির জন্য চা বানাতে গেলে কিছু সুবিধা পাওয়া যায়
– কী রকম?
– তোমার কাছে কি টাকা আছে?
– কত?
– তুমি কিছু তামাক পাতা আর একটা দেশলাই কিনে বাজারের বাইরে চলে যাও। তামাক পাতা আর দেশলাই এমনভাবে রাখবে যাতে সবাই দেখতে পায়। তাহলে কেউ তোমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করবে না। আমি তোমার পেছনে শুকনো খড় আর ছাগীর দুধ নিয়ে আসছি। এই বাজারের মধ্যে তামাক পাতা পোড়ানো নিষেধ
– আমাকে ডেকেছ কেন?
– আর শোনো। খাসিয়া দাও এখানে এভাবে ধরে না কেউ। এভাবে ধরে যারা নতুন তারা। এখানকার লোকজন বাজারের মধ্যে ঢুকে গেলে দাও আর হাতে রাখে না। বগলে রাখে। তুমিও রাখো। তাহলে কেউ আর তোমাকে নতুন লোক ভাববে না। যাও তাড়াতাড়ি করো
– কিন্তু আমি কেন করব এসব?
– তোমার চেয়ে আমার গায়ে জোর কম। আমি তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারব না

এখানে এক মণের নিচে কোনো তামাক বিক্রি হয় না। এটা পাইকারি বাজার। আমাকে লোকটা এক বস্তা তামাক গছিয়ে দিলো। তামাকের বস্তা মাথায় আর দেশলাইটা হাতে নিয়ে আমি হাঁটতে লাগলাম। পেছনে তাকিয়ে দেখলাম বেশ দূরে মেয়েটি হাতে দুধের বাটি আর খড়ের একটা বোঝা মাথায় নিয়ে এমনভাবে আসছে যেন আমাকে আপ্যায়নে তার খুব তাড়া আছে

বাজারের বাইরে এসে খোলা জায়গায় তামাকের বস্তাটা নামিয়ে রাখলাম। মেয়েটা কাছে এসে বলল– তুমি যে এতটা বোকা তা কিন্তু অনুমান করিনি
– মানে?
– তোমার কাছে খুচরা পয়সা আছে?
– কেন?
– আমাকে কয়েকটা টাকা দাও। খুচরা যাই থাকে দাও। এখানে কাজের আগে মজুরি দেবার নিয়ম
– কিসের মজুরি?
– এই খড়গুলো দিয়ে তাড়াতাড়ি মশালের মতো কয়েকটা আঁটি বানাও। একটাতে আগুন ধরিয়ে হাঁটতে শুরু করো
– আমি এসবের কিছুই বুঝতে পারছি না। কী বলছ এসব?
– টাকা দাওতো

পকেট হাতড়ে কয়েকটা টাকা পেলাম খুচরা। তার হাতে দিতেই সে আঁচলে গিঁট দিয়ে রাখল– তুমি এখন তামাক ব্যবসায়ী। এই তামাকের বস্তা বয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমাকে মজুর রেখেছ। আমি তোমাকে রেল লাইন পর্যন্ত বস্তাটা দিয়ে আসব। রেল লাইনের ওপারে তোমার লোক থাকবে
– মানে?

তামাকের বস্তাটা মাথায় নিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটা– বোকারাম। তুমি কি আবারো বাজারে ফিরে যাবার চিন্তা করছ?
– তাহলে?
– আমরা পালাচ্ছি
– ফুল মিঠাই?
– খড়ের একটা গোছায় আগুন ধরিয়ে সামনে হাঁটো। লোকজন দেখলে আমাকে জোরে জোরে হাঁটার জন্য তাড়া দেবে। ...এই তামাকের নাম জানো তুমি?
– তামাকের নাম?
– বসুন্ধরা পাতা। লোকজন তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে কী তামাক কিনলে। জানা থাকা দরকার

খড়ের একটা গোছায় আগুন ধরিয়ে আমি হাঁটতে লাগলাম
– বাকি খড়গুলো মাফলারে বেঁধে পিঠের সাথে ঝুলিয়ে রাখো। আর দাওটা রাখো ডান হাতে। খোলা। আমরা বাজারের বাইরে চলে এসছি এখন
– কিরে মজুরি দিয়েছে ঠিকমতো?
একটা লোক উল্টো দিক থেকে যেতে যেতে মেয়েটিকে প্রশ্ন করল। মেয়েটি আঁচলে রাখা পয়সাগুলো বাজিয়ে শোনাল। সাথে সাথে সে প্রশ্ন করল– সামনে আরো দুটো লোক দেখলে তামাকের বস্তা মাথায়?
– না তো?
– বোধ হয় ওদের আগুন নিভে গেছে। কোথাও আগুন জ্বালানোর জন্য থেমেছে তাই দেখতে পাওনি
– হবে হয়ত। সাবধানে যাবি। পথ কিন্তু পিছলা
বলতে বলতে লোকটা পাশ কেটে চলে গেলো। আমাকে কিছুই জিজ্ঞেস করল না আর
মেয়েটা আমাকে ডাক দিলো– তোমার মাথায়তো আর এক মণ তামাকের বস্তা নেই। অত জোরে হাঁটো কেন? এই বস্তা নিয়ে হাঁটতে বুঝি কষ্ট হয় না আমার?
– তাহলে আমার কাছে দাও
– না। তাহলে চেয়ারম্যানের লোকরা রাস্তায় আটকাবে। এখানে যারাই কিছু কিনতে আসে তাদেরকে মুটে নিতে হয়। এটা এলাকার নিয়ম। এটাই এ এলাকার লোকদের একটা বড়ো পেশা। ...দেখি তোমার খড়গুলো নামাওতো

খড় নামালাম। সে বস্তা খুলে অর্ধেকের বেশি তামাক ফেলে দিয়ে বস্তার মধ্যে খড় ভরে নিল। বাকি খড়গুলো আবার আমার কাছে দিয়ে বলল– এখন বেশ হালকা। চলো

হাঁটতে থাকলাম আমরা। অন্ধকার এখন বেশ ঘন। মেয়েটা তামাকের বস্তা থেকে আরো তামাক ফেলে দিয়ে পুরোটাই খড়ের বস্তা করে নিল। বলল– এসব রাস্তা আমি রাতেও চিনি। আগুন নিভিয়ে দেশলাইটা পকেটে রাখো। কেউ জিজ্ঞেস করলে তার কাছে আগুন চেয়ে বলবে বাতাসে খড় নিভে গেছে। আর তোমার কাছে আগুনও নেই। এসো
অন্ধকারের মধ্যে মেয়েটা আমার হাত জড়িয়ে ধরল– তুমি ফুল নিতে এসেছিলে তাই না?
– হ্যাঁ
– না নিয়ে চলে যাচ্ছ যে?
– তুমিইতো নিতে দিলে না
– তুমি যা চাও তা ওখানে নেই

– খুঁজেইতো দেখিনি। জানব কী করে যে আছে কি নেই
– আমি জানি। ওখানে নেই। ওখানে মা ছাড়া কেউ আমার বয়স জানে না। ওরা জানে এখনো আমার বয়স হয়নি
– কিসের?
– আমি যাতে ওরা জানার আগেই পালাতে পারি সেজন্য মা সব সময়ই আমার বয়স লুকিয়েছে। বলেছে এখনো বহু দেরি। আর আমিও সব সময় ছোটদের পোশাক পরে থেকেছি আর ছোটদের মতো ফুল-পাতা-লতা দিয়ে খেলেছি। যাতে সত্যি সত্যিই আমাকে ছোট দেখায় আর সবাই ছোট মনে করে
– তুমি পালিয়ে কোথায় যাবে?
– যাব কেন? যাচ্ছিতো। তোমার সাথে
– আমার সাথে?
– এখানে আর কেউ আছে নাকি?

একেতো রাত। তার উপর আমরা যাচ্ছি ঘুরপথে, যাতে কারো সাথে দেখা না হয়। কিন্তু তারপরও দুয়েকবার আমাদের দেখা হয়ে গেছে কারো কারো সাথে। হয়ত আরো কেউ কেউ ঘুরপথে যেতে পছন্দ করে। তাদের সাথে বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে হয়েছে। আমি বলিনি। যা বলার মেয়েটিই বলেছে। দেখা হবার সাথে সাথে সে আগ বাড়িয়ে তাদেরকে পথ জিজ্ঞেস করেছে যাতে তারা ভাবে সত্যিই আমরা অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলেছি। তাতে সময় আর কষ্ট দুটোই বেড়েছে দুয়েকবার। কারণ তারা পথ দেখানোর পর আমাদেরকে তাদের সাথে মূল পথে ফিরে যেতে হয়েছে। তারপর তারা চলে গেলে আবার কষ্ট করে ফিরে আসতে হয়েছে ঘুরপথে

যখন রেল টানেলের কাছে এলাম মেয়েটি খড়ের বস্তাটা ফেলে দিয়ে আমাকে টিলার দিকে উঠতে বলল– এদিকে গেলে চা দোকানের পেছন দিক দিয়ে একেবারে উঠানে বের হওয়া যাবে

ভোর হয়ে গেছে। আমরা যখন টিলার মাথায় উঠলাম তখন ওপাশের দেশওয়ালি গ্রামের লোকজন কাউকে গাই দোয়াতে আবার কাউকে দুধের পাতিল মাথায় করে নিয়ে যেতে স্পষ্ট দেখা গেলো। আমরা নামতে শুরু করলাম। পাশের একটা ঘন ঝোপের ভেতর থেকে এক মহিলা একটা দুধের পাতিলসহ হাজির হলো আমাদের সামনে। আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম। কিন্তু মেয়েটি সাথে সাথেই মহিলাকে জিজ্ঞেস করে বসল– তোমাদের দুধ লাল না সাদা গো?
– লাল দুধ। আমরা গরুকে আলাদা পানি খাওয়াই না। ঘাসের সাথে গরু যে পানি খায় তাতেই আমাদের গরু দুধ দেয়
– কোথায় বিক্রি করবে?
– বিক্রি করব না। চাওয়ালার কাছে নিয়ে যাচ্ছি। প্রতিদিন আমরা দশ ঘর লোক দশ পাতিল দুধ দিয়ে যাই তাকে চা বানাবার জন্য
– আমরা তার সাথে নেমে এলাম বাড়ির পেছন দিকে। সে আমাদের উঠানে যাবার রাস্তা দেখিয়ে দিলো– তোমরা ওদিকে যাও। আমি পাকঘরে দুধগুলো পৌঁছে দিয়ে বাড়ি যাব। তারপর মেয়েটির কাছে গিয়ে আমার দিকে ইঙ্গিত করে বলল– তোমার সাথের মরদটা বোবা নাকি?
– কেন?
– কোনো কথা বলে না যে?
– ও বিদেশের লোক। এই এলাকার ভাষা বোঝে না বলে লজ্জায় বেশি কথা বলে না সে
– ও আচ্ছা। তাই হবে বুঝি

আমরা যখন সামনে এলাম তখন দোকানি চায়ের কাপ আর মগ সাজিয়ে বসে আছে। আমাদের দেখেই বলল– কাল রাতে স্বপ্নে দেখেছি আজ আমি জোড়া কাপ চা দিয়ে দিন শুরু করব। বহুদিন হয় জোড়া কাপ চা দিয়ে দিন শুরু করতে পারি না। প্রতিদিনই বেজোড় লোক থাকে। আপনারা হাতমুখ ধুয়ে নিন। আমার পানি বহু আগে থেকেই গরম হয়ে আছে। দুধটাও চুলায় বসিয়েছে আমার মেয়ে। আপনাদের দিয়েই আজ শুরু করব

মেয়েটি আমাকে রাস্তা দেখাল। বাড়ির ডানপাশে একটু ঝোপের মতো। সেদিকে এগিয়ে গেলেই ঠিক নিচে একটা ঝরনা। ঝরনার পাড়ে পাথর বিছিয়ে সিঁড়ি করা। আমরা দুজন হাতমুখ ধুয়ে যখন উঠলাম মেয়েটি বলল– তোমার সাথেতো গামছা নেই। মুখ মুছবে কী করে?

– লাগবে না। বাতাসে শুকিয়ে যাবে

– তা হয় না। এলাকার বদনাম হবে। অতিথি ভেজা মুখে বাড়ির উঠানে দাঁড়ালে গৃহস্থের অপমান হয়

– এটা তোমার বাড়ি না

– আমার এলাকা

– ঠিক আছে আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকি। মুখ শুকালে উঠব

– তুমি আমার সাথেই উঠবে। এই নাও

মেয়েটি তার আঁচল বাড়িয়ে দিলো আমার দিকে– নাও মুখ মুছে নাও

ওর আঁচল যখন মুখে ছোঁয়ালাম তখন কড়া লিকারের চা পাতার সাথে ঘন করে জাল দেয়া দুধ মিশিয়ে চা বানালে যে ঘ্রাণ পাওয়া যায় সেই ঘ্রাণে ভরে গেলাম আমি। আমি মুখ মোছা রেখে ওর আঁচল শুঁকতে থাকলাম। এ গন্ধ শৈশবের পরে আর পাইনি। আমি ওর আঁচল মুখে চেপে দাঁড়িয়ে থাকলাম। মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠল– আমার আঁচল এভাবে আটকে রাখলে আমাকে যে খোলা বুকেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে

আঁচলটা মুখে চেপে রেখেই তাকালাম তার দিকে। চা পাতার মতো কড়া সবুজ এক নির্জন প্রকৃতি আমার সামনে। আমি আঁচলটা তাকে ফিরিয়ে দিতে দিতে বললাম– নলীডোবা নয়। আমার নিজেকে বলা উচিত ছিল আমি ঝরনায় যাব

২০০৪.০৩.১৯

আন্ডুল

শহরটা সত্যিই আলাদা। কথাটা জেনেছিলাম ক্লাস এইটে নিজের শহর নিয়ে বই থেকে মুখস্থ রচনা লিখে স্যারের ঝাড়ি খাবার পর। স্যার শুরু করতেন বেকুবের দল বলে– বেকুবের দল চউখের হান্ড্রেড পার্সেন্ট ব্যবহার করে মাইয়াগো পিঠ আর বুক দেখতে... ছড়া কাটে– পাছাটা চল্লিশ। কিন্তু নিজেগো চউখে চাইলশা। বুঝিস? কুষ্ঠি হবে কুষ্ঠি। তোদের চউখে কুষ্ঠি হবে। সারাদিন টো টো করে ঘোরে কিন্তু দেখে না কিছু। খালি তাকায় গডগড কইরা। নিজের বাড়িতে গরু রাইখা আইসাও গরু নিয়া রচনা লিখতে কইলে বই বিছরায়। পঙ্গুর দল। লুলা ফকির হালারা

দ্বিতীয় স্যারের রাগ গেয়ার সিস্টেম। ট্রাকের মতো। শুরু করেন ফার্স্ট গেয়ারে বেকুব দিয়ে। টপ গেয়ারে উঠলে পৌঁছে যায় বাপ দাদায়। ইস্কুলে বাপ-দাদা তুলে গালি দেবার ঠিকাদারি তার একার। হোক সে ছাত্র অথবা শিক্ষক। তিনি অনেকের আগের জেনারেশনেরও দ্বিতীয় স্যার। এই শহরটা নাকি যখন জঙ্গল ছিল তখন থেকেই তাদের পরিবার এখানে বাস করে। আমরা অবশ্য বলি স্যারের পূর্ব পুরুষ জঙ্গলে শিয়ালের পায়খানা পরিষ্কারের চাকরি নিয়ে প্রথম এখানে আসে। তারপর সুবিধা বুঝে লুঙ্গি বিছিয়ে জায়গা দখল করে এখন শহর-কুতুব বনে গেছে। শহর-কুতুব হবার কারণে প্রায় সবারই বংশ লতিকা স্যারের মুখস্থ। মাঝেমাঝে সেগুলো টেনে রাগের গেয়ার বক্সে লুব্রিকেন্ট হিসেবে ব্যবহার করেন– তোর বাপেওতো একটা ছাগল আছিল। এখন হইছে বলদ। ইস্কুলে আসবি একটু ফিটফাট হইয়া আয়? না। তলপেটের নিচে লুঙ্গিটা কোনোমতে আটকাইয়া আইয়া পড়ল। তারপর হাঁটতে খোলে তো বসতে খোলে। ...এখনতো হেয় শিকল দিয়া বাইন্ধাও নাভির উপরে লুঙ্গি রাখতে পারে না। ঠিকাদারি কইরা পেটটারে এমন গামলা বানাইছে যে মিলিটারি বেল্ট দিয়া বানলেও লুঙ্গি পিছলাইয়া ধনের আগায় আইসা পড়ে। হের পোলা তুই। মানুষ হইবি কেমনে?

স্যারের ইঞ্জিনটা বেডফোর্ড। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বার্মায় যুদ্ধ করতে এসে মিলিটারিরা যে ট্রাকগুলো ফেলে গিয়েছিল ওগুলো দিয়ে নাকি পরে মুড়ির টিন বাস বানিয়ে জেলা টু থানা ট্রিপ টানা হয়। ওগুলো যেমন টপে উঠলে কাঁপতে থাকে গোঁ গোঁ করে। স্যারও সমানে মুখ দিয়ে থুতু ছিটাতে থাকেন। তখন কার বাপ কী ছিল আর কার দাদা কী ছিল সেটা খেয়াল করার চেয়ে বরং হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢাকতে ব্যস্ত থাকি আমরা। বিশেষত সামনের তিন বেঞ্চে যারা বসে

স্যারের নাম কেউ জানে না। হেডস্যারও তাকে দ্বিতীয় স্যার বলেন। আমরা অনেকেই এই নামটা ইস্কুলে ভর্তির আগে বাড়িতে শুনেছি। বাংলা দ্বিতীয়পত্র পড়ান বলেই সারা শহর তাকে এই নামে জানে। ...রচনার খাতা দেখে স্যার থার্ড গেয়ারে উঠে আবার নিউট্রেল করলেন– টাউনে থাইক্কা– সারাদিন টাউনে চক্কর দিয়া সাইরাও যুদি নিজের শহর নিয়া রচনা বই থাইকা মুখস্থ কইরা লেখন লাগে। তয় হইবডা কেমনে? ঘর থাইকা বাইর অইবার সময় কি চউখ দুইডা বাইত রাইখা বাইর অও? ...শুনো। খালি তাকাবা না। দেখবা। ...ওই হালারা তাকানো আর দেখার মইধ্যে পার্থক্য বুঝস?

ডিরেক্ট থার্ড গেয়ার। কেউ বুঝলেও উত্তর দেয় না। উত্তর সঠিক না হলে এক লাফেই গেয়ার চলে যাবে টপে। স্যার একটু থেমে সেকেন্ড গেয়ারে নামেন– লুলা ফকিরের দল। লুচ্চামিতো শিখা ফালাইছ পুটকি থাইকা ফুল পড়ার আগে। নামতা পড়ো, না? ছেমড়ি কোঠার নামতা? পাছাটা চল্লিশ– বুকাটা ছত্রিশ– রানাটা উনত্রিশ? ছি ছি ছি। মাইনষে নামতা শিখে অংক করার লাইগা। আর তোরা নামতা করস মাইয়াগো শইল মাপতে? ...ওই হালারা মাইয়ার পাছা চল্লিশ হউক আর বিয়াল্লিশ ইঞ্চি হউক তোগের কী? ছুইতে পারবি? তোগো মতো পোলারে হেই মাইয়ারা ধনও মনে করে না। তোরা হেগোর কাছে নুনু। নুনু আর ধনের পার্থক্য বুঝস?

আমরা সবাই একসাথে হেসে উঠি। এইবার এক লাফে টপ উঠে যাবার কথা। কিন্তু স্যার গেয়ার নিউট্রেল করেন– হেইডাতো ঠিকই বুঝো ...শোনো তাকানো হইল চউখ বুলানো। আর দেখা হইল চউখের সামনের কোনো একটা বিষয়রে গভীরভাবে অনুভব করা। বিশ্লেষণ কইরা সেই জিনিসের অর্থ নিজের মতো কইরা নিজের ভিতরে ধারণ করা। যতদিন পর্যন্ত না কোনো জিনিসের নিজস্ব অর্থ নিজের মইধ্যে তৈরি করতে পারবা ততদিন পাঠাই থাকবা। মাইনষের পূজার কামে বলি হইবা। নিজে পাইবা ধনডা। ...স্যার থামেন। থামার দুটো অর্থ আছে। হয় আবার ছেমড়ি কোঠার নামতা ধরে এক লাফে উঠে যাবেন টপে। না হয় নিউট্রেল

ছেমড়ি কোঠার নামতাটা আমরা কেউ বানাইনি। স্কুলে এসেই শিখেছি। কে যে কার কাছ থেকে শিখেছে তা আবিষ্কারের জন্য গবেষণা দরকার। তবে আমাদের যাদের বাবারা এই স্কুলে পড়তেন তারাও এই নামতা জানতেন কনফার্ম। অন্য স্কুলের ছেলেরাও জানে। সুতরাং পল্লিগীতির মতো এর নামতাকারও অজ্ঞাত। সবগুলো বয়েজ স্কুলেই ছেলেরা নিজেদের উদ্যোগে এরকম নামতা শেখে আর শেখায়। কম্বাইন্ড অথবা গার্লস স্কুলে কী করে জানি না। কিন্তু আমরা করি। মাঝেমাঝে ক্রিয়েটিভ কেউ কেউ এটাকে অনুকরণ করে দুয়েক লাইন নামতা কিংবা ছড়া নিজেই বানায়। যেমন– মাইয়া একে মাইয়া/ বড়ি-কনডম লইয়া/ বাড়ি বাড়ি যাইয়া/ কাম খুঁজে কাম। ...এটা আমাদের একজনের মৌলিক রচনা, শিরোনাম– আত্মকর্মসংস্থান। কিন্তু এ ধরনের রচনা কেন জানি বেশি জনপ্রিয়তা পায় না। দুয়েকদিন চলে তারপর আবার বাদ পড়ে যায়। হয়ত আমাদের এইসব নামতাকাররা অত বেশি ক্রিয়েটিভ না। তাই

আমরা অপেক্ষা করছি স্যারের টপ গেয়ারের। কিন্তু স্যার ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলেন। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলে তিনি একেবারে চোস্ত বাংলায় কথা বলেন। আমরা বলি শান্তিনিকেতনি বয়ান– শোনো বাছারা, পর্যবেক্ষণের উপরে কোনো শিক্ষা নাই। কিন্তু পর্যবেক্ষণকে উপলব্ধিতে রূপান্তর করতে হয়। একেক মানুষের পর্যবেক্ষণ আর উপলব্ধি ভিন্ন বলেই মনুষ্য সমাজে উপলব্ধির এত তারতম্য। একই পুষ্পের দিকে তাকিয়ে কেউ দেখে কাঁটা কেউ দেখে পাপড়ি। কিন্তু সকল মৃগই পুষ্পকে খাদ্য হিসেবে দেখে। কেউ তাতে সৌন্দর্য যেমন খুঁজে পায় না। কোনো যন্ত্রণার উৎসও পায় না। সেজন্যই তাদের নিয়তি হলো মানুষের ইচ্ছার উপর জীবন ধারণ করা। মানুষের প্রয়োজন মেটানো। ...তোমরা মনুষ্য সন্তান। তোমাদের পিতামাতারা হাতের মুঠোয় প্রাণ ধারণ করে তোমাদের পাঠিয়েছে মানুষ হবার জন্য। তোমরা যদি ছাগশিশুই থাকো তবে আমরাইবা তাদের কাছে কী জবাব দেবো? ...মানুষ হতে হলে চেষ্টা লাগে। ...শুধু গতর-খাটনিরে চেষ্টা বলে না। মানুষের চেষ্টা মানে তার মস্তিষ্কের চেষ্টা। ...স্যার বন্ধ ইঞ্জিনে হঠাৎ থার্ড গেয়ার দিয়ে বসলেন– ওই হালারা এই শহরের বাইরে আর কে কোন টাউনে গেছিস হাত তোল

যারা যারা অন্য শহরে গেছে হাত তুলল। স্যার জানতে চাইলেন কে কীভাবে গেছে। কেউ বলল বাসে। কেউ বলল ট্রেনে। কেউ বলল লঞ্চে চড়ে গেছে। ...স্যার হাসলেন। ...তাইলে? তাইলে চুদির পুতেরা নিজের শহরের রচনা লিখতে কইলে বই দেইখা মুখস্থ কইরা লিখতে হয় ক্যান?

বুঝলাম না কিছুই। স্যার আবারও নিউট্রেল করলেন। অন্য টাউনের মানুষগো জিগাইয়া দেখিস তারা নিজের শহর থাইকা অন্য শহরে গেলে কেমনে যায়। দেখবি যে কইব লঞ্চে যায়। সেই শহরের অন্যরাও লঞ্চেই যায়। কিন্তু... আমাগো শহর। যাতায়াতের তিনটা ব্যবস্থাই বিদ্যমান। এইটা কি একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য না রে লুলা ফকিরের দল? বাংলাদেশে কয়টা টাউন আছে এমন? অই উচা হোটেলডার ছাদে গিয়া খাড়াবি। দেখবি ডাইনে লঞ্চঘাটে লঞ্চ আইতাছে। সোজা তাকাবি দেখবি ট্রেইন ছাইড়া যাইতাছে। তারপর তাকাবি বামে। বাস স্ট্যান্ড। ...খেয়াল করছস কোনোদিন?

আমরা খেয়াল করিনি কিন্তু তিনটা জিনিসই আছে তা জানি। বহুবার গেছিও। স্যার বলার পর খেয়াল করলাম। আর এও জানলাম যে বাংলাদেশে খুব কম শহরেই আছে এই জিনিস। স্যার যোগ করলেন– বাংলাদেশে অন্য কোনো

শহরে যাতায়াতের এই তিন ব্যবস্থা থাকলেও এক জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে তিনটাকে দেখা যায় না। এটা একমাত্র আমাদের শহরেই সম্ভব

এরপর থেকে আমরা মনে মনে চাইতাম সবগুলো পরীক্ষাতেই শহর বিষয়ক রচনা আসুক। লেখা কাহাকে বলে আর কাহাকে বলে আমাদের শহর দেখিয়ে দেবো। কিন্তু এসএসসি পর্যন্ত কোনো পরীক্ষাতেই এই রচনাটি এল না। তারা হয়ত বুঝে গেছে যে আমরা সবচেয়ে বেশি নম্বর পাব। এইজন্য দেয়নি। যারা পরীক্ষার প্রশ্ন করে তারা সব বড়ো বড়ো নামকরা ইস্কুলের মাস্টার। তারা চায় তাদের ইস্কুলই ভালো রেজাল্ট করুক। এজন্য নাকি তারা প্রশ্ন করার আগে খোঁজ নেয় তাদের ইস্কুলের ছাত্ররা কোন কোন প্রশ্নের উত্তর ভালো করে লিখতে পারবে। সেভাবেই প্রশ্ন করে। হয়ত সারা বাংলাদেশেই হালারা খোঁজ করে দেখেছে নামীদামি কোনো ইস্কুলের ছাত্রই আমাদের শহর বিষয়ে রচনা লিখতে পারে না। তাই দেয়নি। ...অবশ্য সেদিনের পরে আমাদের অনেকেই বাংলা দ্বিতীয়পত্র বই থেকে রচনা অংশটি কেটে ফেলে দিয়েছিল। খামাখা মোটা বইয়ের বাড়তি ওজন টানার কী দরকার? রচনা পড়তে হয় না। রচনা শুধু লিখতে হয়। কারণ তখন স্যারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী সবকিছু দেখার চেয়ে আমরা পর্যবেক্ষণ করি বেশি। স্যারের পূর্বপুরুষ যে শিয়ালের হাগু পরিষ্কার করত তাও আমাদের পর্যবেক্ষণেরই ফল। অবশ্য স্যারের আরো একটা সতর্কবাণী আছে– লিখতে হলে চাই সঠিক বাক্য গঠন

আমাদের ইস্কুল থেকে বছরে মেট্রিকে যতজন পাশ করে ফেল করে তার থেকে অনেক বেশি। কিন্তু যত কম নম্বর পেয়েই ফেল করুক না কেন বাংলা দ্বিতীয়পত্রে আজ পর্যন্ত কেউ পঞ্চাশের নিচে পায়নি। স্যারের বিভিন্ন গেয়ারের ঝাড়ি খেয়ে একেবারে পোকায় খাওয়া ছাত্রটিও সঠিক বাংলা বাক্য গঠনে পুরোদস্তুর কামেল। যদিও এই ইস্কুলের ইতিহাসে স্যারের হাতে বাংলা দ্বিতীয়পত্রে কেউ পাশ করার কোনো ইতিহাস নেই। ক্লাস সিক্স থেকে এসএসসির টেস্ট পরীক্ষা পর্যন্ত স্যারের হাতে কেউ পাশ করেনি কোনোদিন। এ নিয়ে কারো মাথা ব্যথাও নেই। হেডস্যার কিংবা বাড়ির বড়োরাও যখন রেজাল্টের জন্য ঝাড়ি দেন তখন দ্বিতীয় স্যারের বাংলা দ্বিতীয়পত্র বাদ দিয়েই বলেন। কারণ ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে স্যারের হাতে যে ২০ পায় সে এসএসসিতে পায় ৫৫। ২১ পেলে ৬০। একবার স্যারের হাতে একজন ২৫ পেয়েছিল। সে এসএসসিতে সেকেন্ড ডিভিশন পেলেও বাংলা দ্বিতীয়পত্রে পায় লেটার মার্ক। সে এখন এই শহরেই একটা মুদি দোকান দেয়। আমরা সবকিছু পর্যবেক্ষণ করে তার দোকানের নাম দিয়েছি শেরে বাংলার দোকান। ...আমরা হিসাব করে দেখলাম স্যারের হাতে যদি কেউ ৩৩ পায় তবে এসএসসিতে তাকে ১০০র মধ্যে পেতে হবে দুইশো। ...থাক বাবা দরকার নেই। দ্বিতীয় স্যারের খাতায় আমাদের সর্বোচ্চ টার্গেট ২১

আমাদের ইস্কুল শেষ হয়ে গেলো। বাংলা দ্বিতীয়পত্রে ১১জন পেলো ফার্স্ট ডিভিশন নম্বর। এদের মধ্যে চারজন এসএসসিতে ফেল। তাতে আমাদের কিংবা ফেল করাদের কিছু যায় আসে না। ওরা যে যে বিষয়ে ফেল করেছে সেই সেই বিষয়ের স্যারদেরকে সামলাতে হবে দ্বিতীয় স্যারের বিভিন্ন গেয়ারের বয়ান। হেডস্যারও বাদ যাবেন না। সাধারণত প্রতিটি এসএসসির রেজাল্টের পরেই স্কুলে রেজাল্ট পর্যালোচনা মিটিং বসে। হেডস্যার চেষ্টা করেন এই মিটিং থেকে দূরে থাকতে। এই দিনে দ্বিতীয় স্যারের বেডফোর্ড ইঞ্জিন হেডস্যার–হুডস্যার মানে না– ফকিরনির পুতেরা কোর্টের প্যাদা হওনের যোগ্যতা নাই, হইছে মাস্টার। ...পোলারা যুদি নিজেরা পাশ করতে পারত তাইলে তোগো ধন চুষতে ইস্কুলে আহে? এইবার হেডস্যারের দিকে ফিরে– এগো জরিমানা করা দরকার। যার পেপারে একটা ছাত্র ফেল করব তার এক মাসের বেতন কাটা। তুমি এই মাসেই জরিমানা চালু করো। ...হালারা শিক্ষকের মর্যাদা চাইবা কিন্তু দায়িত্ব নিবা না?

হেডস্যার এই মিটিং থেকে পালান। কোনোদিন পেটের অসুখ কোনোদিন বাচ্চা অসুস্থ বলে। হেডস্যারের চাচা আর বড়ো ভাই দ্বিতীয় স্যারের ছাত্র। ছোটবেলায় মা মারা যাবার কারণে হেড স্যারের স্কুল লাইফ কাটে মামা বাড়িতে। না হলে তিনিও দ্বিতীয় স্যারের ছাত্র হতেন। অবশ্য দ্বিতীয় স্যার হেডস্যারকে নিজের ছাত্রই ভাবেন। আর বংশের মুরব্বিদের স্যার বলে হেডস্যারও দ্বিতীয় স্যারকে তা ভাবতে বারণ করার সাহস করেন না। তাতে না আবার কোন

সময় বংশের ছাগল আর গাধাদের তালিকা প্রকাশ হয়ে পড়ে কে জানে। থাক বাবা। সারা শহরের যিনি দ্বিতীয় স্যার। তিনি না হয় তারও স্যার হলেন

একবার দ্বিতীয় স্যার ছুটিতে থাকা অবস্থায় এই পর্যালোচনা মিটিং হয়েছিল। সেদিন হেড স্যারের পেটের অসুখ কিংবা বাচ্চার কোনো অসুখ ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় স্যার ফিরে এসে বললেন তিনি যদি জানতেন রেজাল্ট পর্যালোচনা মিটিং হবে তাহলে ছুটি নিতেন না। ওই মিটিংয়ে তার কিছু বলার আছে। সুতরাং মিটিং আবার হবে। ...হেডস্যার একবাক্যে মেনে নিলেন। গাইগুঁই করলে ফেঁসে যাবেন। স্কুলে রেজাল্ট পর্যালোচনা মিটিং হবে অথচ যার ছাত্ররা সবচেয়ে ভালো করল তাকে জানানো হয়নি কেন? এই প্রশ্ন যদি দ্বিতীয় স্যার করে বসেন? সুতরাং হেডস্যার আবার মিটিং ডেকে সেই দিন নিজের কিংবা বাচ্চার একটা অসুখ বাঁধিয়ে আর স্কুলে এলেন না

শুনেছি অনেক স্যারই এসএসসির রেজাল্টের আগে মিলাদ দিতেন যাতে দ্বিতীয় স্যারের পেপারে একটা ছাত্র হলেও ফেল করে। আর যখন অন্য স্কুলে পরীক্ষা ডিউটি পড়ত তখন খামাখাই তারা বাংলা দ্বিতীয়পত্রে যে কোনো একটা ছেলে বা মেয়েকে বহিষ্কার করার সুযোগ খুঁজতেন। একবার একজন এসে বেশ গর্ব করে বললেন– বাংলা সেকেন্ড পেপারে আজ তিনটাকে এক্সপেল করেছি। দ্বিতীয় স্যার আশেপাশে ছিলেন। সোজা ধরে বসলেন কলারে– খানকির পুত। খুব সওয়াবের কাম করছ না? ওই তিনডা পোলার একটা কইরা বছর ফিরাইয়া দিবার পারবি? ...পোলারা নকল করে কেন? করে তোগো মতো খানকির পুতেরা মাস্টার এই কারণে, করে তোগো মতো শিক্ষিত চুদির পুতেরা এমন সাউয়ামারানি সিস্টেম কইরা রাখছে এই কারণে। ...আরেকদিন শুনলে বিচি দুইটা খুইলা হাতে ধরাইয়া দিমু। ...আমার কোনো পোলা নকল করে?

স্যার জীবনে কোনো ছাত্রী পড়াননি। ছাত্র বলতেই পোলারা বলেন। পরীক্ষার হলে তার ডিউটির সময় কাউকে নকল করতে দেখলে কাছে গিয়ে বলেন– পুতেরা। পাশতো করা লাগবই। কিন্তু আমাদেরও যে ডিউটি করা লাগবে সেইটাও একটু মাথায় রাইখো

মার্কশিট দেবার দিন দ্বিতীয় স্যার সেজেগুজে আসতেন। ফেল করা ছাত্রদেরও খবর দিতেন এসে মার্কশিট নেবার জন্য– নিজেরই সবার আগে দেখা দরকার কোন জায়গায় দুর্বলতা আছে। আসিস। পরীক্ষায় একবার ফেল করলে দশবার পাশ করা যায়। আসোল পাশ-ফেল জীবনে। সেইখানে চান্স মাত্র একবার

পাশ করা ছাত্ররা মার্কশিট নিতো হেডস্যারের হাত থেকে। আর ফেল করা ছাত্রদের মার্কশিটগুলো খুব যত্ন করে তুলে দিতেন দ্বিতীয় স্যার। এই সময় দ্বিতীয় স্যার ছাড়া কেউ কোনো কথা বলত না। ছোট হেডস্যার একটা একটা করে মার্কশিট তুলে দিতেন হেডস্যার কিংবা দ্বিতীয় স্যারের হাতে। তিনি দ্বিতীয় স্যারের সরাসরি ছাত্র। পাশ করাদের মার্কশিট দেয়া শেষ হয়ে গেলে দ্বিতীয় স্যার একজন একজন করে ডাকতেন– বাংলা দ্বিতীয়পত্রে সেভেনটি টু। সাবাস। তারপরেই জিবে কামড় দিতেন– সাধারণ গণিতে ছাব্বিশ, ...খানকির পোলা যে কোন বালটা পড়ায়। তারপর হয়ত আরেকজন– ইস আর দুই পাইলেইতো কাম বানাইছিলি। লেটার মার্ক। ইংরেজিতে খারাপ, ...শোন ডিসি ফুডে চাকরি করে রতন। আমার ছাত্র। ওরে গিয়া আমার কথা কইবি। তোরে ইংরেজি দেখাইয়া দিবো। হেয় ইংরেজি খুব ভালো পারে। তার অফিসাররাও তারে দিয়া ইংরেজি চেক করায়

এইদিন দ্বিতীয় স্যার ক্লাস নিতেন না। সারাদিন থাকতেন ছাত্রদের সাথে। ছাত্রদের সামনে স্যারের বেডফোর্ড ইঞ্জিনটি বন্ধ থাকত সারাদিন। শুধু যে যে বিষয়ে ছাত্ররা ফেল করেছে সেই টিচারদের সামনে পেলেই একলাফে চলে যেত টপ গেয়ারে। ক্লাসে ক্লাসে নিয়ে গিয়ে জুনিয়রদের সামনে বিদায়ি ছাত্রদের বিভিন্ন গুণের কথা বলতেন। যারা ফেল করেছে তাদেরও। স্কুলের পিওন দপ্তরিদের ডেকে বলতেন– এরা যে পাশ করছে তাতে তোমাদেরও অবদান আছে। পোলাগোরে দোয়া করো, ...বাচ্চা পোলাপান। কোনোদিন কোনো কারণে কষ্ট দিলে মনে রাইখ না। পেছনে বদ-দোয়া নিয়া যেন আমার পোলারা সামনে না যায়

মার্কশিট আনার দিন ছুটিরও অনেক পর পর্যন্ত দ্বিতীয় স্যার আমাদের সাথে আড্ডা দিলেন। আড্ডাইতো। পাশ করা ফেল করা সব ছাত্র একসাথে। স্যার হাসছেন। বললেন– ছাত্ররা বাসায় গেলে তোদের ভাবী খুশি হয়। ভাবী? স্যারের বৌকে কী ডাকা যায় তা নিয়ে আমরা কোনোদিন মাথা ঘামাইনি। না ঘামিয়েই ধরে নিয়েছিলাম হয় চাচি না হয় নানি হবেন তিনি। কিন্তু স্যার বললেন ভাবী। ...দ্বিতীয় স্যার সত্যিই বদলে গেছেন

আমরা স্যারের পা ছুঁয়ে সালাম করলাম স্কুলের মাঠে দাঁড়িয়ে। স্যারকে কেমন মনমরা দেখাল– পুতেরা। একটা কথা মনে রাইখো। ইস্কুল কলেজ থাইকা মানুষ মূলত কিছুই শিখে না। ইস্কুল কলেজে শুধু কেমন কইরা শিখতে হয় সেই রাস্তাটা শিখে। চউখ কান খোলা রাখবা। দেখবা শিখার লাইগা বই মুখস্থ করতে হয় না। প্রতিটা জ্যান্ত মানুষই একেকটা বিশ্বকোষ, ...মানুষ দেখবা। যে যত বেশি মানুষ দেখার ক্ষমতা অর্জন করতে পারবা সেই তত বেশি শিক্ষিত হইবা। যাও পুতেরা, ...সামনে যাও

স্যার স্কুলেই থাকলেন। ছাত্ররা বাড়ি গেলে স্যারের বৌ খুশি হন জেনেও আর যাওয়া হলো না স্যারের বাড়িতে। সম্ভবত স্যারের শেষ কথাটাই সত্য। সামনে যাও। এখন আর দ্বিতীয় স্যার কিংবা স্কুল নিয়ে বছরে একবারও ভাবি না আমরা

আমরা সবাই একটা কলেজেই ভর্তি হয়েছি। এখন পরিবারের লোকজনের দৃষ্টিও বদলে গেছে। এলাকার লোকজনেরও। কলেজে পড়ি কথাটা জানার পর পাবলিক আমাদের কিছুটা বাড়তি দাম দেয়। আগে যেখানে আড্ডা দিতে গেলে পাড়ার লোকরাই ধমকে বাড়ি পাঠাতো তারাই এখন আমাদের দেখলে অন্যদিকে তাকিয়ে পাশ কেটে যায়। আমাদের যাতায়াতও বেড়ে গেছে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে। সঙ্গে বিড়ি

কলেজটা কো-এডুকেশন। বিশ-পঁচিশটা মেয়েও পড়ে আমাদের সাথে। মেয়েদের সাথে আমাদের খাতির ঠিক জমে না। বন্ধুবান্ধবও বাড়ে না। আমরা যারা এক স্কুল থেকে এসেছি ঘুরে ফিরে তারাই একসাথে থাকি। অবশ্য মেয়েদের সাথে মেশার কিংবা প্রেম করার চেষ্টা যে করিনি তা নয়। ভালোভাবেই করেছি। ...ক্লাসের কয়েকটা মেয়ে আছে নাটক–ফাটক করে। ওরা বেশ ফ্রি। আড্ডা টাড্ডা দেয়। তাদের সঙ্গে খাতির জমাতে গিয়ে দেখলাম আরেক বিপদ। প্রায় সব ক'টাই প্রেম করে। এবং তাদের প্রতিটা প্রেমিকই হয় হারমোনিয়াম বাজানো জানে। না হয় গলাকে মোটা করে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে কবিতা পড়তে পারে

কেউ কেউ হারমোনিয়াম শিখতে গিয়েছিলাম। কিন্তু মাস্টাররা সহজে হারমোনিয়াম শেখায় না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সাথে বসিয়ে সারেগামা করতে বলে। আরে শালা আমরা শিখব হারমোনিয়াম বাজানো। সেখানে সারেগামা গাওয়ার দরকারটা কী? ...কয়েকজন নাটকে ঢোকার চেষ্টাও করেছে। সেটাও একই রকম। ওরা নতুন কাউকে পেলেই লোকজনের সামনে উচ্চারণের ভুল ধরে। টিটকারি মারে। স্বরে-অ স্বরে-আ এইসব পড়তে বলে। তার উপর আছে লাইন ধরে দাঁড় করিয়ে পিটি করানো। তাতেও অসুবিধা ছিল না। না হয় বাংলা বর্ণমালা আবার শিখব। পিটি করব। সারেগামাও শেখা যাবে। ...আমরা মোটামুটি প্লান অনুযায়ী আগাচ্ছিলাম। প্রথম টার্গেট ক্লাসের বিশ্ব সুন্দরী সুমি। আমাদের কথা হলো আমাদের যে কারো সাথে যদি সুমির ইয়ে হয়ে যায় তবে বাকি মেয়েগুলো আপনাতেই আমাদের খাতির করবে। মেয়েরা এমনিতে কাউকে পাত্তা দেয় না। কিন্তু যদি দেখে কারো সাথে অন্য কোনো মেয়ে প্রেম করে তাহলে তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। ...সুমি নাটক করে। একদিন টিকিট কিনে আমরা ওর নাটক দেখলাম

এগুলোর নাম নাকি নাটক। মানুষও পয়সা দিয়ে এসব দেখে। যে জায়গায় রাজবাড়ি সেই জায়গাতেই রাস্তা। সেখানেই কাঠের কুড়াল নিয়ে কাঠুরিয়া কাঠ কাটতে যায়, সেটাই জঙ্গল। আজব সিস্টেম। চিৎকার করে করে কথা বলে। ছেলেগুলোর ঠোঁটেও লিপস্টিক, মুখে ফেস পাউডার। লাইট একবার জ্বলে আরেকবার নেভে। একবার এক

কোনার লাইট জ্বললে আরেক কোনার লাইট নিভে যায়। মানুষতো পয়সা দিয়ে সব কিছু দেখার জন্যই টিকিট কেটেছে। কিন্তু এই যন্ত্রণার কারণে একসঙ্গে স্টেজের এক কোনার বেশি দেখা যায় না। হালাদের চৌদ্দ গুষ্টির কেউ কারেন্টের বাতি জ্বালায়নি মনে হয়। একটা ইলেকট্রিশিয়ানকে ডাকলেওতো হয়। ...শালাদের অবশ্য বুদ্ধি আছে। লাইট নিভে গেলে লোকজন যাতে ক্ষেপে না যায় সেজন্য ভেতর থেকে ঢোল বাজায়। বাঁশি আর হারমোনিয়াম বাজায়

এরকম অত্যাচারও মানুষ নিজের উপর করে? কিন্তু কী আর করা। সুমির নাটক। ...সুমি আসল অনেক পরে। সে কাঠুরিয়ার মেয়ে। বনে কাঠুরিয়ার জন্য খাবার নিয়ে এসেছে। জঘন্য। শাড়ি একটা পরেছে মনে হয় ওর পেটের উপরে শাড়িটাকে জড়ো করে গিঠ্ঠু মেরে দিয়েছে কেউ। ওর বুকের সাইজ থেকে নাভির উপরে শাড়ির গিঁট অনেক বেশি বড়ো। এদের মধ্যে মনে হয় শাড়ি পরাও জানে না কেউ। সুমির শাড়ি পেছন দিকে উঠে আছে আধ-হাত। আর সামনের দিকে কলা পাইকারদের লুঙ্গির খুঁটের মতো মাটিতে গড়াচ্ছে আরো আধা হাত। মাড় দেয়া সুতি শাড়ি। শাড়িটা চারদিকে এমন ভাবে ছড়িয়ে আছে যে মনে হচ্ছে সুতা দিয়ে বানানো মুরগির খাঁচার মধ্যে সুমি ঢুকে বসে আছে। ...আর অভিনয়...। বাপের দিকে যখন কথা বলে তখনও তাকায় দর্শকদের দিকে। ...শালি এই অত্যাচারও সহ্য করছি তোর জন্য। ...কথাটা বুঝলেই হয়

প্লানিং অনুযায়ী নাটকের শেষে সুমিকে কংগ্রেচুলেট করতে গেলাম তার দুর্দান্ত অভিনয়ের জন্য। ...বাট। ...কিন্তু। ...না গেলেই ভালো ছিল। ...সুমি ম্যারিড। ...ও তার স্বামীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো। মিলিটারি অফিসার। টাইয়ের সাথে দারুণ একটা কোট লাগানো। পরে জেনেছি ওই ধরনের কোটকে নাকি ব্লেজার বলে। বুঝলাম বেইল নাই। আমরা কেউই টাই পরা জানি না। ...আমরা কোনোমতে ফিরে আসার ধান্দা করতে না করতেই মিলিটারিটা সবার সাথে হ্যান্ডশেক করল। মনে হলো যেন ঝাঁকিয়ে হাতটাই ছিঁড়ে ফেলবে। তারপর– সি ইউ অল। বাই। বলে সুমির হাত ধরে একটা গাড়িতে উঠে গেলো

বাদ। নাটক হারমোনিয়াম আর মেয়েদের সঙ্গে খাতির। বাদ

আমাদের প্রত্যেকেরই বাইসাইকেল ছিল। প্রথম প্রথম সাইকেলে করেই কলেজে যেতাম। কিন্তু দেখলাম সাইকেল চালানো ছেলেদেরকে মেয়েরা গাঁইয়া ভাবে। এজন্য আর সাইকেল নিয়ে কলেজে ঢুকতাম না। সাইকেলগুলোকে দূরে একটা দোকানের সামনে রেখে নোটবুকটা হাতে নিয়ে হেঁটে কলেজে ঢুকতাম। তার পরেও টাউনের লোকরা আমাদের বলত গাঁইয়া। তাদের কথা হলো পৌরসভার বাসিন্দা হলেই টাউনের লোক হওয়া যায় না। টাউনের লোক হতে হলে অনেক মডার্ন হতে হয়। আমরা গ্রামের লোক কথাটা না মানলেও আমরা যে মডার্ন না তা কিন্তু ঠিক। আমরা বিদেশি পোশাকের ব্রান্ডের নাম জানি না। পারফিউম চিনি না। হলিউডের নতুন সিনেমা দেখি না...। আরো অনেক ঘাটতি আমাদের। সবচেয়ে বড়ো ঘাটতি হলো ফাস্টফুডের দোকানের প্রায় কোনো আইটেমেরই নাম জানি না আমরা। দোকানে গেলে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে এটা দেন ওটা দেন বলে চালাতে হয়। ...তো কী আর করা? আমরা কলেজে গিয়েও আমরা-আমরাই থেকে গেলাম

কলেজে সাহিত্য ফাহিত্য সবই টাউনের ছেলেদের দখলে। পলিটিক্সের কিছু লোক ছড়া আমাদের কেউ পাত্তা দেয় না। স্যাররাও না। পলিটিক্সের লোকজন আমাদের খাতির করার কারণ হলো এক গ্রুপে আমরা অনেকজন। কিন্তু আমরা অনড়– না ভাই পলিটিক্স পয়সাওয়ালাদের জন্য। তাছাড়া কে জানে পলিটিক্সের নামে আবার কোথায় নিয়ে গিয়ে সারেগামা কিংবা স্বরে-অ স্বরে-আ পড়াবে। ...সুতরাং বাদ। বাদ। ...আমরা ঘুরি। ঘুরি সাইকেলে। সারা শহর। মাঝেমাঝে শহরের বাইরেও চলে যাই। যখন বসি তখন গিয়ে বসি হয় রেল স্টেশন, না হয় বাস স্ট্যান্ড, না হয় লঞ্চঘাটে। দ্বিতীয় স্যারের ভাষায় টাউনের যে বৈশিষ্ট্য অন্য সব টাউন থেকে আলাদা সেই স্থানগুলোই হয়ে উঠে আমাদের আড্ডার জায়গা। প্রতিদিন যাই। কেউ না গেলে একাই যাই। এসব জায়গায় একা বসে থাকলেও একা

মনে হয় না। সব সময়ই আশেপাশে প্রচুর লোক। রং বেরংয়ের মানুষ। কত কিসিমের আচরণ। একেকজনের হাঁটা চলা কথা বলা আরেকজন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কেউ একটুতেই ভয় পায় আবার কেউ অন্যকে ভয় দেখায়

ক্লাস এইটে দ্বিতীয় স্যার বলেছিলেন শহরের এই বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তাতে কী হয় তা বলেননি। আমরাও খুঁজিনি। এইসব বিষয় খোঁজ না করেও নিজের শহর বিষয়ক রচনা লেখা যায়। অথবা এর যে কোনো মানে থাকতে পারে তাও মাথায় ঢোকেনি আমাদের। ঢুকিয়ে দিলেন শাহাবুদ্দিন ভাই

তিনি পলিটিক্স করেন। ছাত্র নন, ছাত্রনেতা। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল। সংক্ষেপে বাসদ। বাসদ লিখে ব্রাকেটে মাহবুব লিখতে হয়। মাছুয়াদের মতো চেহারা আর ডাকাতের মতো চোখ হলেও লোকটাকে পছন্দ করার মতো কী যেন একটা আছে। পাতি নেতাদের কাছে আমাদের খবর শুনে তিনি একদিন এলেন কথা বলতে। সরাসরি তুমি দিয়ে কথা শুরু করলেন। গলাটা ক্যাটক্যাটে কর্কশ এবং কাউকাউ করে কথা বলে লোকটা। কিন্তু প্রতিটা শব্দ একেকটা বুলেট। গেঁথে যায়– আমি তোমাদেরকে আমার দলে যোগ দেবার কথা বলতে আসিনি। বলতে এসেছি তোমরা কোন কোন দলে যোগ দেবে না
– তাতে আপনার সমস্যা কী?
– তোমরা আমার দেশের ছেলে। আমাকে পছন্দ করো আর নাই করো তোমাদের বাঁচিয়ে রাখা আমার দায়িত্ব
– আমরা পলিটিক্স করব না
– কেন জানতে পারি?
– ওটা বড়োলোকদের বিষয়
– এরকম বিশ্বাস থাকার কারণেই সবার চোখ তোমাদের দিকে। তোমাদের মতো গ্রামের ছেলেরা কম টাউট হয়। যা করে বিশ্বাস থেকে করে। ...তোমাদেরকে ভুল কিছুও যদি বিশ্বাস করিয়ে দেয়া যায় তোমরা সেটাকেই ধরে থাকবে
– আমাদের ধারণা ভুল?
– একশো ভাগ। ...আমাদের দেশে বড়োলোকরা মন্ত্রী হয়– এমপি হয়। এটা দেখে যারা হতাশ তারাই এরকম কথা বলে। কিন্তু রাজনীতিতে বড়লোকদের যায় আসে না কিছু। যায় আসে আমাদের। তোমাদের। চেঞ্জটা বড়োলোকদের জন্য দরকার নেই। দরকার তোমার আমার মতো মানুষদের

লোকটা একবারও তার দলে যাবার কথা বলল না। কিন্তু অনেক কথা বলল। কথাগুলো নতুন। আসোলে আমাদের কারো পরিবারে রাজনীতি করা লোক নেই। আমরাও ব্যাপারটাকে নিয়ে ভাবিনি এর আগে। ইলেকশনের সময়– তোমার ভাই আমার ভাই, অমুক ভাই তমুক ভাই। এসবকেই রাজনীতি ধরে নিয়ে দূরে থাকতাম। দ্বিতীয় স্যারও এই বিষয়ে কোনোদিন কিছু বলেননি। নাহলে নিশ্চয়ই বিষয়টা নিয়ে ভাবতাম

তিনি কিছু বিষয় খেয়াল করতে বললেন। বললেন মূর্খ বন্ধুর চেয়ে জ্ঞানী শত্রুকে বেশি পছন্দ তার। আমরা যদি কিছু কিছু বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নিয়ে তার দলের বিপরীত কোনো দলও করি তাতেও তিনি খুশি। কারণ তিনি ধরে নেবেন আমরা যা করছি তাতে মানুষের জন্য ক্ষতিকর কিছু নেই

আরেকদিন এলেন। সরাসরি বললেন আমাদের টাউনের কোন জিনিসটি অন্য শহর থেকে আলাদা? আমরা লঞ্চঘাট– রেলওয়ে স্টেশন আর বাস স্ট্যান্ডের কথা বললাম। তিনি হাসলেন– ভালো। কিন্তু এটা হলো জিওগ্রাফিকাল অ্যাডভান্টেজ। এটা কেউ ইচ্ছা করে বানায়নি। শহরটাকে অন্য শহর থেকে আলাদা প্রমাণ করার জন্যও করেনি। ভৌগলিকভাবেই শহরটা আলাদা অবস্থানে হওয়ার কারণে আস্তে আস্তে এই তিনটা যোগাযোগ গড়ে উঠেছে অটোমেটিক্যালি। কিন্তু এর ফলাফল কী?
– স্থল জল আর রেল। তিন পথেই আমাদের লোকজন বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত করতে পারে, যা অন্য শহরের লোকজন পারে না

ঠা ঠা করে হেসে উঠলেন শাহাবুদ্দিন ভাই– শিশুদের রচনা প্রতিযোগিতায় কথাগুলো লিখলে প্রথম পুরস্কার পাবে তোমরা। ...কিন্তু এর কারণে কী পরিবর্তন চোখে পড়ে?

মূলত কিছুই পড়েনি চোখে। পড়তে যে হবে তাই বা কে জানত? তিনি এর আগে আমাদের যে যে বিষয় খেয়াল করতে বলেছেন তার মধ্যে এই জিনিসটি নেই। না হলে আমরা খেয়াল করে রাখতাম। ...তিনি নিজেই উত্তর দিলেন– পাগল, ঠিকানাবিহীন পাগল। একটা সমাজে মানুষ কী অবস্থায় আছে তা বিচার করার জন্য মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষের সংখ্যা আর ধরন হচ্ছে একটা প্রধান মানদণ্ড। ...একটা দেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো জনগণের কতটা বন্ধু তা বিচারেরও একটা বড়ো মানদণ্ড হলো ঠিকানাবিহীন পাগল। ...আমাদের শহরে অন্য যে কোনো শহরের তুলনায় পাগলের সংখ্যা বেশি। এরা এই শহরের লোক নয়। বাসে–ট্রেনে–লঞ্চে এই শহরে আসে। আসে আমাদেরই সমাজের অন্যান্য অংশ থেকে। যাতায়াতের ব্যবস্থা বেশি বলে পাগলের সংখ্যাও বেশি আমাদের শহরে। ...বাস-ট্রেন আর লঞ্চের সাথে যে এরকম একটা রাজনীতি জড়িয়ে আছে তা জীবনেও আমাদের মাথায় ঢুকতো না যদি না শাহাবুদ্দিন ভাই ধরিয়ে দিতেন

তার দলে আমরা যোগ দিয়েছিলাম কি না এখনও পরিষ্কার নয়। আমরা কোনো কাগজপত্র পূরণ করিনি। মিছিলেও যেতাম না। কিন্তু শাহাবুদ্দিন ভাইয়ের সাথে থাকতাম। তিনি কলেজে আসতেন না তেমন একটা। আমরা সাইকেল চালিয়ে গিয়ে পার্টি অফিসে হাজির হতাম। কখনও তিনি বলতেন। কখনও আমরা প্রশ্ন করতাম। লোকজন আমাদেরকে বাসদের ছেলে বলত। শাহাবুদ্দিন ভাই কিছুই বলতেন না

আমরা হয়ত তার দল পুরোপুরিই করা শুরু করে দিতাম। হয়ত মিছিলও করাতাম। ...একদিন শাহাবুদ্দিন ভাই কলেজে এলেন। দলের লোকজনের সাথে একটা ঘরে দরজা বন্ধ করে মিটিং করলেন। আমাদেরকে বললেন তার সাথে কথা না বলে যেন চলে না যাই। মিটিং শেষে আমাদের সাথে বসলেন। কে কী করতে চাই। কী ভাবছি, কী পড়ছি জানলেন। বললেন– কলেজে এমনভাবে ঢুকবে না যেন একটা পিঁপড়াও টের পেলো না তুমি এলে। আবার এমনভাবে ঢুকবে না যেন মাটি কাঁপে। ...দ্বিতীয় স্যারের একটা কথার সাথে মিলে গেলো কথাটা– এমন বড়ো হইও না ঝড়ে ভাঙব মাথা/ এমন ছুড়ু হইও না ছাগলে খাইব পাতা

দুদিন পর শুনলাম শাহাবুদ্দিন ভাই আমেরিকা চলে গেছেন

আমরা আমাদের সাইকেলে ফিরে এলাম। এবার সাইকেলগুলো চলতে লাগল পাগলদের পেছনে। ...একটা অদ্ভুত বিষয় দেখলাম। বাড়িঘর ছেড়ে যে পাগলরা এই শহরে এসেছে তারাও সব সময় থাকে মানুষেরই আশেপাশে। নির্জন জায়গায় একটা পাগলও নেই। ব্যাপারটা সত্যিই আজব। পাগলও একা থাকতে পারে না। ...শহরের লোকজন আমাদের চিনে গেলো। কোনো নতুন পাগল দেখলেই খবর দিত। অনেকের সাথেই আমাদের খাতির জমে গেলো। আবার অনেকে আমাদেরকে দেখতে পারত না। অনেকের কাছ থেকেই ঠিকানা উদ্ধার করা যেত। কয়েকজনের ঠিকানায় আমরা যোগাযোগও করেছি। লোকজন এসে তাদেরকে নিয়েও গেছে। অনেকের বাড়ি থেকে কোনো উত্তর কিংবা মানুষ কেউ আসেনি। কেউ অনেকদিন ধরেই এখানে আছে। কেউ নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে হঠাৎ করে অন্য কোথাও

আমরা পাগলদের নাম দিতাম। একজনের নাম ছিল প্রফেসর লিয়াকত। সে তার নাম বলত না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সারাক্ষণ বক্তৃতা করত। কাপড়চোপড় বেশ সাফসুতরো। কিন্তু প্রায় সময়ই পরনের প্যান্ট থাকত খোলা। কোনো কোনো সময় প্যান্ট খুলে মুঠো করে ধরে মাইক বানিয়ে রাস্তায় বক্তৃতা করত। বক্তৃতার বিষয় অর্থনীতি। তার নাম প্রফেসর লিয়াকত হবার কারণ হলো আমাদের অর্থনীতি পড়াতেন লিয়াকত স্যার। যতটুকু না পড়াতেন তার চেয়ে বেশি বলতেন শিক্ষক পলিটিক্সের কথা। কী কারণে তিনি ফুল প্রফেসর হতে পারেননি। অনেক আগেই তার প্রমোশন হয়ে যেত যদি তেল মারতে পারতেন ইত্যাদি ইত্যাদি। ...তাকে প্রফেসর বললে তিনি খুব খুশি হতেন। সেই স্যারের

নামে এর নাম প্রফেসর লিয়াকত। আমরা প্রায়ই প্রফেসর লিয়াকতের বক্তৃতা শুনতাম। মাঝেমাঝে প্যান্ট পরিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিয়েও দেখেছি। কী করে যেন সে আবার খুলে ফেলে। তার বক্তৃতার মূল কথা ছিল– যে জাতি অর্থনীতি বোঝে না, সেই জাতি মরা জাতি। ...একটানা অনেকক্ষণ বক্তৃতা করার পর সে বজ্রকণ্ঠে তার পরবর্তী কর্মসূচি জানিয়ে আলটিমেটাম দিত– আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সবাই যদি অর্থনীতি না বোঝে তাহলে...। তা হলে...। তাহলে সে কী করবে আর বলতে পারত না। ...তাহলে ...পরবর্তী কর্মসূচি পরবর্তীতে জানিয়ে দিতে বাধ্য হব। তারপর লোকজনের দিকে ফিরতো– যাও বাড়ি যাও। মিটিং শেষ। আর কত? নিজে কিছু বুঝতে পারো না? যাও বাড়ি গিয়ে ঘুমাও

একজন ছিল চেম্বার সভাপতি। টেলিফোনে বড়ো বড়ো বিজনেস ডিল করত। হাতের মুঠো কানের কাছে নিয়ে ফোনে কথা বলত সে। সব বড়ো বড়ো কথা– হ্যাঁ এক কোটি টাকার চেকতো দিলাম। আর দিলে ব্যবসা থাকে কই? হ্যাঁ হ্যাঁ... তারপর নিজেই মুখে আরেকটা ফোনের রিং বাজাতো– ক্রিং ক্রিং। এরপর– রাখেন ভাই আমার একটা ফোন এসেছে বলে অন্য হাতে পাশের ক্রেডল থেকে ফোন তোলার ভঙ্গি করে ওই ফোনে আবার কথা বলা শুরু করত। আবারও সেই বড়ো বড়ো ব্যবসা– না না শিপমেন্ট হয়নি। এলসি তো আগেই করেছি। এই সব

কাব্যাঙ্কবিদের নাম দিতে গিয়ে মুশকিলে পড়তে হয়েছে আমাদের। প্রথমে ভাবছিলাম পিথাগোরাস। কিন্তু এই পিথাগোরাসের অঙ্ক কখনও মিলে না। সে লোকজনকে ধরে আনে অঙ্ক মিলিয়ে দেবার জন্য। তার সব অঙ্কই দুই সংখ্যা নিয়ে। ইটের টুকরো দিয়ে রাস্তায় অঙ্ক করে। দুই যোগ দুই সমান চার। দুই যোগ দুই সমান তিন। দুই যোগ দুই সমান দুই। দুই যোগ দুই সমান এক। ব্যাস। এই তার অঙ্ক। পরপর লাইনগুলো লিখে একা একা কথা বলে– এটা ঠিক হলে ওটা কী? ভুল? কিন্তু কেন? তাহলে কি সবগুলো ঠিক? নাকি সবগুলো ভুল? ...তখনই আশেপাশে তাকায়। লোক ধরে এনে বলে– এই শিক্ষিত ভাই। আমার অঙ্কটা করে দে। কেউ তার অঙ্ক করতে পারে না। তখন কবিতা শুনতে হয়। তাও একটা নির্দিষ্ট কবিতা– 'অঙ্ক করো। অঙ্ক করো/ অঙ্ক মেলে না/ তুমিতো মানুষ ছিলে/ দেবতা ছিলে না।' এরপরেই জিজ্ঞেস করে– বল তো শিক্ষিত ভাই এটা কার কবিতা? বেশিরভাগই বলতে পারে না কবির নাম। সে নিজেই বলে– কিশওয়ার ইবনে দিলওয়ার। সেও অঙ্ক পারে না। মাথায় গণ্ডগোল...

চা– চায়ের দোকান আর বিড়ি। আড্ডার তিন উপাদান। ...বাস স্ট্যান্ডে চা খাচ্ছি। কারো শেষ কারো বাকি। হঠাৎ এক পাগলি দোকানের দিকে এগিয়ে এল। কিছু বুঝে উঠার আগেই চায়ের কাপ– পানির গ্লাস– জগ সব একটা একটা করে টেবিলে উপুড় করে রেখে আবার দ্রুত বের হয়ে গেলো। কোন দিকে গেলো দেখার সুযোগ রইল না। জগের পানি– কাপের চা টেবিলে গড়িয়ে কাপড়চোপড় মিসমার হয়ে গেছে ততক্ষণে। একটু সামলে নিয়ে দোকানিকে জিজ্ঞেস করতে বলল গতকাল থেকে দেখা যাচ্ছে। একা একা কী যেন বিড়বিড় করে আর সামনে যা পায় তাই উল্টো করে রাখে

পাগলিটা আজব। তরুণী। কারো সাথে কথা বলে না। হাঁটে আর বিড়বিড় করে– একলা কেমনে অতকিছু ঠিক রাখি। সব উল্টা। কেউ কিচ্ছু দেখেও না। বুঝেও না। ...আমাদের চায়ের কাপও সে উল্টায়নি। ঠিক করে রেখেছে। কারণ কাপগুলো মূলত উল্টো ছিল। কিন্তু লোকজন কি আর তার মতো অত বুদ্ধিমান? মোটেই না। ফলে তাকে দেখলেই লোকজন নিজের জিনিসপত্র সামলাতে শুরু করে অথবা লাঠি নিয়ে তাড়ায়। তাড়া খেলে গালাগাল দেয় গুষ্টি তুলে –বেক্কলের গুষ্টি। নিজেতো কিছু বুঝেই না, আবার বুঝাইতে গেলে মারে। ...খালি চোখ থাকলেই হয় না। চোখের মধ্যে মণিও থাকতে হয়। বেক্কলের ঘরের বেক্কল

আধ্যাত্মিক গালি। হারমোনিয়াম কিংবা নাটক থেকেও কঠিন। আমরা বুঝি না। শহরে অন্য কেউও বোঝে বলে মনে হয় না। কেরোসিনের টিন– দুধের বালতি– জিনিসপত্র উল্টো করে রেখে এমন আধ্যাত্মিক বিষয় শেখার ইচ্ছাও শহরে কারো নেই। কিন্তু এর মধ্যেই সে একটা নাম পেয়ে যায়। কারা যেন তার উল্টি পাগলি নামটা চালু করে দেয়। এই নামটা আমাদের দেয়া না। সবকিছু উল্টায় কিংবা সব কিছুকেই সে উল্টা অবস্থায় দেখে বলে এই নাম। দারুণ

নাম। অন্য কোনো নাম দিতে আর গেলাম না আমরা। আমরা বেশ কয়েকবার চেষ্টা করলাম তার সাথে কথা বলতে। বলে না। কোত্থেকে এসেছে– কে কে আছে না আছে কিচ্ছু বলে না। আর ভাষা বিষয়ে আমাদের এত দখল নেই যে তার ভাষা শুনে বুঝব সে কোন এলাকার লোক। কিন্তু সে থাকে কোথায় তা তো জানা দরকার

শহরটা ছোট হলেও মানুষ খুঁজে বের করার জন্য বহু বড়ো। তার উপর পাগল। ...সারাদিন গেলো। অদরকারি পাগলদের পাই কিন্তু উল্টিকে পাই না। আমাদের সাইকেল শহর থেকে বের হয়ে পড়ে বাইরে। আবার শহরে। বাস স্ট্যান্ড থেকে লঞ্চঘাট। লঞ্চঘাট থেকে রেল স্টেশন। নাহ। আবার চক্কর দেই আগের জায়গায়। নেই। কেউ বলে আজ একবার দেখেছে। কেউ বলে– না। ...সন্ধ্যায় তাকে স্টেশনে পেলাম। এক কোনায় বসে একটা বোতল ওলট পালট করছে আর কাঁদছে– শান্তিতে থাকতে পারবি না। কাউরে শান্তিতে থাকতে দিমু না। আমার সবকিছু উল্টাইয়া দেওনের সময় মনে ছিল না?

আমরা যে তাকে দেখছি সে খেয়ালই করে না। আপন মনে বোতলটা একবার উল্টাচ্ছে আবার সোজা করছে। অথবা একবার সোজা থেকে উল্টা আবার উল্টা থেকে সোজা করছে। বিড়বিড় করছে। ফুঁপিয়ে কাঁদছে। একটাই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছে বিভিন্নভাবে– শান্তিতে থাকবি? থাক না দেখি কেমনে থাকস। আমি থাকতে দিলেতো?

কে তার শান্তি নষ্ট করল, কে তার কী উল্টা করে দিয়েছে? কিছুই মাথায় ঢোকে না। আমাদের একজন বোতলটা চেপে ধরে। উল্টি তাকায়। ঠান্ডা গলায় বলে– ছাড়ো
– এটা এভাবে থাকবে
– ছাড়ো। এইভাবে থাকব না
– এইভাবেইতো সোজা
উল্টি একটা মরণ চিৎকার দেয়। আমাদের বন্ধুটি ছেড়ে দেয়। পাগলি আবার বোতল ওলটপালট করতে থাকে। আমরা দাঁড়িয়ে আছি। তাকায়। তার গলা ঠান্ডা– তোমরাও কি তাদের লোক?
– কাদের লোক?
উল্টি কোনো উত্তর দেয় না। তার কাজ সে করতে থাকে। আবার চোখ তুলে তাকায়– ওদের লোক না হইলে আমার লগে লাগো ক্যান?

এ তো আরেক সক্রেটিস। কিছু জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয় না। কিন্তু নিজে একেকটা কথা বলে যায় বাণী চিরন্তনীর মতো

ওর সাথে আমাদের খাতির হয়ে গেলো। ছেলেরা তাকে তাড়া করলে এসে আমাদের কাছে দাঁড়ায়। ক্ষিদে পেলে এসে বলে। আবার যাবার সময় কিছু না কিছু একটা উল্টো করে দিয়ে যায়। আমরাও সাবধান। তাকে দেখলে সবকিছু সামলে রাখি। কাপের তলানির চা ফেলে দিয়ে তার সামনেই উল্টে রাখি টেবিলে। মাঝেমাঝে ওর সামনে আমরা বিভিন্ন জিনিস রাখি। সে একটার পর একটা উল্টায় আর বকবক করে– আমি একলা মানুষ। অত কাম কেমনে করি। কেউ বুঝে না। ...একদিন তার সামনে একটা টেনিস বল রাখলাম। সে প্রথমে বলটাকে উল্টে রাখল। উল্টানোর পরও টেনিস বলটা দেখতে একই রকম। সে আরো কয়েকবার ওলটপালট করল। তারপর দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো– দুর এইডা আবার কী জিনিস? এইডার উল্টাও নাই সোজাও নাই

মাঝেমাঝে সে তার সবকিছু ঠিকঠাক-করণ কর্মসূচিতে আমাদেরকে দিয়ে এসিস্টেন্টগিরি করায়। বড়োসড়ো কিছু উল্টাতে হলে দৌড়ে এসে হাতে ধরে সমানে টানতে থাকে– আসো না। আসো। ...আমরাও যাই। তার সাথে অনেক কিছু উল্টাই কিংবা সোজা করি। একবার ট্রেনের একটা কম্পার্টমেন্ট দেখিয়ে বলালাম– উল্টাবে? ...অনেকক্ষণ করুণ চোখে তাকিয়ে থাকল– দরকার তো। কিন্তু অনেক বড়ো। তোমরাও পারবা না

আমাদের পরিবারগুলোতে বিএ পাশ করাকে অনেক বড়ো পাশ মনে করা হয়। ধরা হয় বিএ পাশ করলেই অফিসে লেখাপড়ির চাকরি পাওয়ার জন্য যথেষ্ট পাশ হয়ে গেছে। সুতরাং বিএটাই আমাদের পড়াশোনার শেষ পর্যায়। এই শহরে এর বেশি পড়া যায়ও না। এর বেশি পড়তে হলে বড়ো শহরে গিয়ে হোস্টেলে থাকতে হয়। সেইসব পড়ে মানুষ ডিসি-এসপি হয়। আমাদের কারো পরিবারের অত খরচ করে ছেলেকে হোস্টেলে রেখে জজ-বারিস্টারি পড়ানোর ক্ষমতা নেই। আর লোকজন আমাদেরকে অত বড়ো অফিসার বানানোর কথা ভাবেও না। বড়োজোর সরকারি অফিসে একটা কাঠের চেয়ার পাওয়ার মতো চাকরি কিংবা কোনো এনজিওতে মটর সাইকেল পাওয়া যায় এরকম সাইজের অফিসার পর্যন্ত ভাবে। এর জন্য বিএ পাশই যথেষ্ট। এইটুকু পাশের চাকরি হলেই শহরের লোকজন তার নামের সাথে সাহেব যুক্ত করে ডাকে

কলেজে মেয়েদের পেছনেও ঘোরা হয়নি আর। তাছাড়া মেয়ে বলতে আর নেইও। মেয়েরা প্রায় সবাই বিএতে ভর্তির আগেই বিয়ে করে সংসার শুরু করে দেয়। কেউ কেউ বিয়ের পর চোখে মুখে ঝকমকে ভাব আর গলায়–ঠোঁটে লাল লাল ফোলা দাগ নিয়ে কয়েকদিন কলেজ করে। কিন্তু পরীক্ষা প্রায়ই দেয় না। পরীক্ষার আগেই তাদের কোলে একটা করে বাচ্চা চলে আসে। ...দেখতে ভালো না বলে যাদের সহজে বিয়ে হয় না তারা ভর্তিও হয় ক্লাসও করে। মেয়ে পড়াশোনায় থাকলে তার বয়স বেশি মনে হয় না। তাই এরা পড়াশোনা চালিয়ে যায়। পাত্রী এখনও স্টুডেন্ট কথাটা অভিভাবকরা বলতে পছন্দ করেন। তাতে মেয়ের অতদিন ধরে কেন বিয়ে হচ্ছে না তার কোনো যুক্তি দেখাতে হয় না। কিন্তু এদেরকে কোনো ছেলেই তুমি বলে না। প্রথম থেকেই তুই বলে। তারাও ছেলেদের সাথে তুই-তোকারি করে। কাউকেই তুমি বলতে যায় না। সুতরাং...

পরীক্ষা একেবারে কাছে। ফেল করলে হয় দুবাই চলে যেতে হবে না হয় মুদি দোকানে বসতে হবে। ...আড্ডা কমে এল। বেড়ে গেলো নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি পড়া। যেখানে বিএ পাশ লোক চায় সেসব জায়গায় শুরু হলো বিএ পরীক্ষার্থী বলে দরখাস্ত করা। কিছু কিছু ডাকও এল। উল্টি কিংবা অন্য পাগলদের সাথে দূরত্ব বেশ বেড়ে গেলো। পরীক্ষা শেষে হতে না হতেই পরিবারের চোখ বদলে গেলো আমাদের দিকে। দরকারি টাকা চাইলেও বড়োরা কেমন যেন তাকায়। যার অর্থ হলো– দামড়া পোলা বাড়ি থেকে টাকা নিতে লজ্জা করে না? কামাই করো। অনেক তো হলো এবার নিজে কিছু করো

অনেকেই করে। টিউশনিও করে অনেকে। কিন্তু আমাদের কারোই ওই জিনিসটা করার ইচ্ছেও নেই। যোগ্যতাও নেই। সুতরাং আমাদের আর কিছু করা হয় না। শুধু দরখাস্ত করার পর খুঁজি কার জানাশোনা আছে। সে যদি একটু বলে দেয় কিংবা টেলিফোন করে...

পরীক্ষা শেষ হবার সাথে সাথেই আমাদের দুজন শহর ছাড়ল। নিজের শহরে বিএ পাশ করা গেলেও বিএ পাশের চাকরি পায়নি ওরা। আমরা একজনকে ট্রেনে আর আরেকজনকে বাসে তুলে দিতে দিতে নিজেরা কবে বাস-ট্রেন অথবা লঞ্চ চড়ব সে চিন্তা করতে লাগলাম। ...আড্ডাটা ভাঙা শুরু হলো। যাদের চাকরি হচ্ছে না তারাও চলে যেতে লাগল। চাকরি পেতে হলে যেখানে চাকরি পাওয়া যায় সেখানে গিয়ে চেষ্টা করা ভালো। কেউ রাজধানীতে কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে উঠল। কেউ গিয়ে উঠল মেসে

আমরা সবাই আমাদের শহর ছাড়লাম। যাতায়াতের তিনটা পথেই ছেড়ে গেলাম আমাদের শহর। একা একা। বাসে–ট্রেনে–লঞ্চে। তিনটা জায়গাই আমাদের খুব চেনা। কিন্তু এখন যখন কাউকে তুলে দিতে যাই তখন কেমন অচেনা লাগে। একজনকে বিদায় দেবার পর একটা মিনিটও সেখানে থাকতে ইচ্ছে হয় না। নিজেদের দল থেকে একজনকে কমিয়ে আমরা দ্রুত ফিরে যাই ঘরে

সর্বশেষ কে শহর ছেড়েছে জানি না। তবে আমাদের এই শহর-কুতুবের দলের একটা মানুষও আর থাকেনি নিজের শহরে। ছড়িয়ে পড়ে সবাই। বাইরে। আমাদের আড্ডা– দ্বিতীয় স্যার– শাহাবুদ্দিন ভাই আর উল্টি পাগলির শহরে

আর থাকা হয় না আমাদের। শহর বিষয়ক রচনা লেখার শহরে আমরা আর থাকলাম না কেউ। অথবা সবই থাকে ঠিকঠিক জায়গামতো শুধু আমরাই ছিটকে পড়ি বাইরে

আমাদের কারো কারো নিজস্ব অফিস হলো। কারো ছোটখাটো ব্যবসা হয়ে গেলো। কেউ সত্যি সত্যি অফিসার হয়ে গেলো আরো কিছু পাশ দিয়ে। কেউ জায়গা কিনল। বাড়ি বানাল কেউ। বৌ আর বাচ্চা হলো সবার। সবই অন্য শহরে। আমাদের শহরে শুধু আমাদের জন্য থাকল বছরে একটা উৎসব। উৎসবে আবার সবাই গিয়ে জড়ো হই আমাদের রচনা লেখার শহরে। ...প্রফেসর লিয়াকত এখনও প্যান্ট খুলে অর্থনীতি করে। কাব্যাঙ্কবিদ মানুষকে ধরে এনে এখনও অঙ্ক আর কবিতা করায়। চেম্বার সভাপতির ল্যান্ড ফোনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মোবাইল। ...দ্বিতীয় স্যার মারা গেছেন। উল্টির খবর জানে না কেউ

আমাদের চোখে চশমা। চুলে কলপ। চেহারায় মেনে ও মানিয়ে নেয়া মানুষের মুখ। ...আড্ডায় আমরা স্মৃতিচারণ করি। হাসা যায় কিংবা হাসানো যায় এমন স্মৃতি। দ্বিতীয় স্যার বা উল্টির কথা নিয়ে তখন হাসতাম। ভাবতাম অর্থহীন আবোলতাবোল। এখন মনে হয় কথাগুলোর হয়ত কোনো অর্থ আছে। এমন অর্থ যাতে নিজেকে দায়ী করার মতো লুকোনো দীর্ঘশ্বাস পড়ে। তাই দ্বিতীয় স্যার কিংবা উল্টির কথা ভুলেও বলি না কেউ। শুধু অবাক হয়ে খেয়াল করি কখন যেন আমরা নিজেদের চায়ের খালি কাপগুলো রেখে দিয়েছি উল্টো করে। তখন কোথাও যেন উল্টির সাথে কোরাস করে দ্বিতীয় স্যার চেঁচিয়ে উঠেন টপ গেয়ারে– হালার পুতেরা কানা ফকিরের গুষ্টি, লুলা ফকিরের দল। বোঝেও না কিছু, দেখেও না কিছু। বেক্কলের ঘরের বেক্কল
২০০৬.৬.১৫

মাটি

ডালিম এখন ঘুমুচ্ছে। শিখু দাস জলপট্টি দেবার ন্যাকড়াটা হাতে নিয়ে উঠানে দাঁড়ায়। উঠানে টাটকা রোদ। কাপড়ের টুকরাটা ঘাসের উপর মেলে দেয়। আকাশে তাকায়। হাত দিয়ে সূর্য আড়াল করে কী যেন দেখে। উঠে ঘরের দিকে গিয়ে দাওয়া থেকে আবার ফিরে আসে। কাপড়টা কয়েক হাত টেনে এনে আবার মেলে দেয়। আবার আকাশে তাকায়। দুই হাতে কাপড়টার দুই কোনা ধরে হাতে ঝুলিয়ে রাখে। ঘাড় ঘুরিয়ে আশেপাশে তাকায়। এক পাক ঘুরে এসে আগের জায়গায় দাঁড়ায় আবার। আবার কাপড়টা বিছিয়ে দেবার জন্য নুয়ে পড়ে। কিন্তু বিছায় না। উঠে দাঁড়ায় কাপড়টা হাতে নিয়ে। কয়েক কদম এগিয়ে বড়ো করে একটা চক্কর মারে। এবার তার চোখে পড়ে উঠানের একপাশে কাপড় মেলে দেবার জন্য একটা বাঁশ টানানো আছে। হাতের ন্যাকড়াটা নিয়ে সেদিকে এগিয়ে যায়। কাপড়টা ঝেড়ে বালি ফেলে বাঁশের উপর মেলে দেয়। অস্পষ্ট বিড়বিড় করে। আবার কাপড়ের টুকরাটা বাঁশ থেকে নিয়ে এসে উঠানে মেলে দিয়ে ধরে বসে থাকে। আকাশে তাকায়– কী রইদরে বাবা। জিতা মানুষ শুঁটকি কইরা ফালায়
মাথা ঘুরিয়ে কাপড়ের টুকরাটার দিকে তাকায় শিখু দাস। একটু হাসে– দূর শুকাইব কেমনে। আমিইতো ছায়া দিয়া বইসা আছি
এবার কাপড়টা পোটলা করে হাতে নিয়ে রোদের মুখোমুখি বসে। হঠাৎ তার কী যেন মনে পড়ে। পোটলা করা ভেজা কাপড়টা নিয়ে দ্রুত ঘরের দাওয়ায় উঠে। চাটাইয়ের দরজাটা টেনে দেয়া ছিল। সেটা সরাতে গিয়ে খেয়াল হয় হাতে ভেজা কাপড়ের পোটলা। আবার নেমে আসে উঠানে– দুরো কিচ্ছু মনে থাকে না আমার...

শিখু দাস কাপড়টা মেলে দেবার জন্য আবার উঠানের দিকে যেতে যেতে ঘরের ভেতর থেকে ডালিমের গোঙানি শোনে। আবার ফিরে যায় ঘরের দিকে। এক দৌড়ে। দরজা সরিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে কাপড়টা দরজার উপরে রেখেই ভেতরে চলে যায় শিখু দাস

খাটের উপর আঠারো বছরের ডালিম কাঁথাগুলোকে জড়িয়ে আছে নাকি কাঁথাগুলোই তাকে জড়িয়ে আছে বোঝার উপায় নেই। ওই কাঁথা এবং ডালিমের ভেতর থেকেই গোঙানির আওয়াজটা আসছে। শিখু দাস ডালিমের মাথায় হাত রাখে। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে কপাল। শিখু দাস ডালিমের মাথায় হাত বোলাতে থাকে– বাজান। বাজান আমি কাপড় ভিজাইয়া আনছি। মাথায় পট্টি দিলে জ্বর কমবো

পট্টির কথা মুখে আসতেই তার খেয়াল হয় জলপট্টির কাপড়টা কই? শিখু দাস ডালিমের কাঁথা সরিয়ে কাপড়টা খোঁজে। নেই। খাটের নিচে খোঁজে। নেই। দেয়ালে টাঙানো যিশুর ছবির পেছনে দেখে। সেখানেও নেই। কিন্তু তার স্পষ্ট মনে আছে পুকুর থেকে কাপড়টা সে ভিজিয়ে এনেছে। তাহলে কাপড়টা যাবে কোথায়? ডালিমের মা শিখু দাস ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঘোরে আর ভাবে। কাপড়টা গেলো কই? বজ্জাত পোলাপানগুলাওতো আসেনি। তাহলে কাপড়টা নিল কে?
– যাউক। আমি আরেকটা ভিজাইয়া আনতাছি বাপ

ঘরের কোনা থেকে নিজের একটা শাড়ি হাতে নিয়ে বের হতে গিয়ে দরজার উপর ভেজা কাপড়টা দেখতে পায় শিখু দাস– দুরো জলপট্টির কাপড় আমি রোদে দিছি শুকাইতে। আমার যুদি একটাও কিছু মনে থাকে ঠিকঠাক মতো

একটানে দরজার উপর থেকে কাপড়টা নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখে এটা দিয়ে জলপট্টি হবে কি না। নাহ। আবার ভেজাতে হবে।... থাউক। এইটা থাউক। শাড়িটাই ভিজাই

শিখু দাস দুটো কাপড় নিয়েই উঠানে নামে। একবার ঘরের দিকে তাকায়। আবার রোদের দিকে। একবার একটা চক্কর দিতেই চোখে পড়ে কুটি তার ঘর থেকে বের হয়ে শার্ট গায়ে দিতে দিতে উঠান ক্রস করে যাচ্ছে। শিখু যাতে তাকে না দেখে সেজন্য শিখুর ঘরের দিকে মাথার ছাতাটা কাৎ করে মুখ ঢেকে কুটি দ্রুত পা চালায়। কুটি তার ছোট ভাই। ফ্যামিলির কর্তা সে। ভাইদের মধ্যে বড়ো আর বাবা ঘরবসা হবার পর সে এই বাড়ির অভিভাবক। ...কুটি ছোটখাট ঠিকাদারি করে, এই দু গাড়ি বালি কিংবা দুইশো বাঁশ সাপ্লাই। এই আর কি

কুটি উঠানের শেষ মাথায় আসার আগেই শিখু দৌড়ে গিয়ে তার ছাতার বাট ধরে পথ আগলে দাঁড়ায়। কুটি বিরক্ত– এই রইদের মইধ্যে ছাতা ধইরা টানাটানি করো ক্যান? কও কী হইছে?
– কুটি। ভাইরে আমার ডালিমরে একবার হাসপাতাল নিয়া যা রে ভাই
– এখন পারুম না। ম্যালা কাম আছে। সইন্ধ্যায় দেখুমনে

কুটি শিখুর হাত থেকে ছাতা ছাড়িয়ে সামনে পা বাড়ায়। শিখু পেছন পেছন দৌড়াতে থাকে– ভাইরে। ও কুটি। কুটি আমার ডালিমরে হাসপাতালে নিবি না ভাই?
কুটি আবার দাঁড়ায়– হাসপাতাল কইলেইতো হয় না। আইচ্ছা নিতে হইলে কাইল নেওয়া যাইব
– ডেইলি ডেইলিই তো কস কাইল নিমু
এইবার কুটি ক্ষেপে যায়– ক্যান আমি নিমু ক্যান? ওর বাপে নাই?
– ওর বাপেরে আমি পামু কই?
– না পাইলে বইয়া থাকো। আমার অত সময় নাই
কুটি আবারও পা বাড়ায়। বাড়ি ছেড়ে রাস্তার কাছাকাছি চলে এসেছে। শিখু আবারও গিয়ে পথ আগলায়– ভাইরে পোলাডারে একবার একটু দেইখা যা ভাই
– দেখার আবার কী হইছে ওর?
– শইলডা পুইড়া যাইতাছে
– এইডা কিছু না। জ্বর। ফুলু জ্বর। এইডা ফুলুর সিজন
– তুই একবার দেইখা যা
– দেখন লাগব না। রাইতে প্যারাসিটামল নিয়া আসুম। খাওয়াইয়া দিবা। এখন গিয়া ওর মাথায় পানি দেও ঠিক অইয়া যাইব

কুটি এগিয়ে যায়। শিখু দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ রোদের মধ্যে। আবার দৌড়াতে দৌড়াতে কুটির পথ আগলে দাঁড়ায়– ও কুটি। কুটি
– আবার কী হইল?
– না কিছু না। তোরে কী যেন কইতে আসছিলাম। ভুইলা গেছি। আইচ্ছা তুই যা। রাইতে মনে কইরা প্যারাসিটামল নিয়া আসিস

শিখু দাস বিড়বিড় করতে করতে বাড়ির দিকে ফিরে আসতে আসতে খেয়াল করে তার হাতে দুটো কাপড়। সে মনে করতে পারে না কাপড়গুলো কিসের জন্য তার হাতে। এর মধ্যে একটা আবার একটু ভেজা। সে ভেজা কাপড়টা

কাপড় মেলে দেয়া বাঁশে মেলে দেয় শুকানোর জন্য। তারপর হাতের শাড়িটার দিকে তাকায়। বোঝে না শাড়িটা তার হাতে কেন। একবার ভাবে হয়ত ধুয়ে দেবার জন্য নিয়ে এসছিল। নাহ। মনে পড়ছে না কিছুই

শিখু দাস হাতের পোটলা করা শাড়ি নিয়ে ঘুরতে থাকে উঠানে রোদের মধ্যে। কিছুতেই মনে করতে পারে না শাড়িটা সে কেন হাতে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এসছিল। এর মধ্যে ভেতর থেকে ডালিমের গোঙানি শোনা যায়। শব্দটা শুনেই শিখু হাতের শাড়িটা নিয়ে ঘরের দিকে দৌড় লাগায়

ডালিম বিছানায় পোটলা হয়ে শুয়ে আছে। মাঝেমাঝে কাৎরাচ্ছে। শিখু ডালিমের মাথায় বুকে হাত বুলায়। পুরো শরীর আগুন হয়ে আছে। শিখু হাত বোলাতে বোলাতে যিশুর ছবির দিকে তাকায়– ঘুমা বাবা। ঘুমা। রাইতে তোর মামায় প্যারাসিটামল আনবো। ঘুমা। যিশুরে ডাক। যিশুর ইচ্ছায় মানুষের কুষ্টি ব্যারামও ভালো হইছে। দেখ দেখ ছবিটার দিকে দেখ। যিশু তোরে দেখতাছে। যিশুরে বল তোরে ভালা কইরা দিতে। বল ডালিম। যিশুরে ডাক। যিশু ছাড়া গতি নাই বাবা। ঘুমা। তোর কিছু হয় নাই। খালি একটু জ্বর হইছে। ফুলু জ্বর। এইটা ফুলুর সিজন। রাইতে তোর মামায় ওষুধ আনবো। ওষুধ খাইলে যিশু তোরে ভালা কইরা দিবো বাপ। ঘুমা

ডালিম কাৎরাতে কাৎরাতে হয় ঘুমিয়ে পড়ে না হয় চুপ হয়ে যায়। কিন্তু শিখু দাস সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়ে ডালিমের শরীরে মাথা দিয়ে। ডালিম কোনো নড়াচড়া করে না আর। শিখু ঘুমায় আর স্বপ্ন দেখে, কুটি এক বস্তা প্যারাসিটামল নিয়ে এসে ঢুকেছে। ঢুকেই ঘুমানোর জন্য শিখুকে গালাগালি করছে– পোলারে খালি আদর কইরা ধইরা রাখলেই অইব? আদরে জ্বর ছাড়ে না। জ্বর ভালা হওনের লাইগা ওষুধ খাওয়াইতে অয়। উঠো

শিখু দাসের নিজেকে অপরাধী মনে হয়। আসোলেই তো। ওষুধ তো খাওয়াইতেই হইব। কুটিকে অন্য সময় যত খারাপ মনে হয় এখন ততটা মনে হয় না। মনে হবেই বা কেন? এই কুটি আছে বলেইতো ছেলেটাকে নিয়ে খেয়ে পরে থাকতে পারছে। ...কুটি একা মানুষ। তারও সংসার আছে। বৌটা পোয়াতি। বাবা ঘরবসা। মা। ছোট দুইটা ভাই। সবইতো কুটির উপর। খামাখা তার উপর রাগ করার কিছু নেই। কতদিক সামলাবে? তাই যখন পারে না তখন আবোলতাবোল করে

শিখু দাস ডালিমের উপর শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখে, কুটি সবগুলো ওষুধ বস্তা থেকে বের করে একটা কাগজের উপর রাখে। তার কাছে পানি চায়। সে গ্লাসে করে পানি বাড়িয়ে দিলে কুটি রেগে উঠে– অতগুলান ওষুধ এই গ্লাসের পানিতে হইব? কলসি কই?
শিখু কলসিটা বাড়িয়ে দেয় কুটির দিকে। কুটি সবগুলো ওষুধ খুলে কলসির ভেতরে ঢোকায়। তারপর হাত ঢুকিয়ে ওষুধগুলো পানির সাথে মেশায়। মেশানো শেষ হলে তার দিকে তাকায়– কই তোমার পোলারে হা করতে কও। ওষুধ খাইব

শিখু দাস ডালিমের দুই চোয়াল ধরে হা করায়। কুটি কলসিটা তুলে আস্তে আস্তে ডালিমের মুখে ওষুধ-গোলা পানি ঢালতে থাকে। ...কুটিটা কোনো কামের না। ঠিকমতো ওষুধের পানিটাও ঢালতে পারে না। পোলাটার মুখ আর মাথাও ভিজে যায় ওষুধের পানিতে। কিন্তু কিছু বলারও উপায় নেই। বললেই বলবে– এই কাম এর থাইকা ভালা কইরা কোনো ডাক্তারেও করতে পারব না। কেমনে পারব? এক কলসি ওষুধ এইটুকু একটা মুখে ঢাললে কিছু না কিছু তো বাইরে পড়বই

তর্ক করা কুটির ছোটবেলার অভ্যাস। শিখু আর কিছু বলে না। তর্ক করলেও কুটির মায়া আছে। এক বস্তা ওষুধ কিনে এনে নিজের হাতে খাওয়াচ্ছে। ডালিমের দিকে তাকিয়ে শিখুর খেয়াল হয় ছোট বেলা কিছু খাওয়াতে গেলেই ডালিম যা খেতো বাইরে ফেলত তার দশ গুণ। এখন অনেকটা সেরকমই দেখাচ্ছে তাকে। তবে এটা সে ইচ্ছা করে করেনি। সে তো ঘুমে। কুটিই ঠিকমতো মুখে ওষুধ ঢালতে পারেনি বলে বাইরে পড়ে গেছে

পুরো কলসি শেষ না হওয়া পর্যন্ত শিখু ডালিমের মুখটা হা করে ধরে রাখে। কলসিটা শেষ হয়ে যাবার পর আস্তে আস্তে আঁচল দিয়ে ওর মুখ মোছায়। ঠিক যেমন ছোটবেলা খাওয়ানোর পর মুখ মুছিয়ে দিত। কিন্তু অতবড়ো ছেলের মুখ কি ওষুধ খাওয়ানোর পর মোছানো সম্ভব? অনেক বড়ো মুখ। মুখটা সে মোছানো শুরু করেছে মাত্র, ডালিম লাফ দিয়ে বিছানায় বসে ধাক্কা দিয়ে ওর হাত সরিয়ে দেয়– তোমারে না কইছি ময়লা শাড়ি আমার মুখে ছুয়াবা না?
– তোর মুখে ওষুধ লাইগা আছে। দে মুইছা দেই
– লাগব না

ডালিম নিজেই হাত দিয়ে এক ঝটকায় মুখ মুছে বিছানায় উঠে দাঁড়ায়। শিখু দাস হাহাকার করে উঠে– কী করস? শুইয়া থাক
– সরো তো। খালি এক ঘ্যানঘ্যানানি। শুইয়া থাক। শুইয়া থাক। খালি খালি শুইয়া থাকন যায়?
– ও ডালিম। বাবা ঘুমা। তোর শইল খারাপ
এইবার ডালিম কুটিকে সাক্ষী মানে– দেহ মামা, মায় কী কয়। মামায় আমারে ওষুধ খাওয়াইল না? অখনও কি আমার শইল খারাপ আছে নি? আসোলে তোমারই মাথায় গণ্ডগোল। পাবলিকে যে কয় মিছা কয় না

ডালিম শিখু দাসকে আর একটাও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে এক দৌড়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। তখন কুটি তার দিকে ফিরে– তোমার পোলারে কইবা খালি ওষুধ খাইলে অইব না। লগে ভাতটাতও খাওন লাগব। না খাইয়া এমুন চক্কর দিলে আবার অসুখ বাদ্ধাইব সে
– হ কমু

শিখু দাস ডালিমের কাঁথাগুলো গোছাতে শুরু করে। এই গরমে এগুলোর আর দরকার পড়বে না। তুলে রাখতে হবে। কুটি কোন সময় বের হয়ে যায় সে খেয়াল করে না। কাঁথা গোছাতে গোছাতে চোখ পড়ে যিশুর ছবির দিকে। যিশু তার দিকে তাকিয়ে হাসছেন– কী রে তুই কি মনে করস কুটির প্যারাসিটামলেই তোর পোলা ভালা হইছে? আমি কিছু করি নাই?

শিখু দাস বিছানার মধ্যেই হাঁটু গেড়ে বসে– মাপ কইরা দেও প্রভু। একটাই পোলা। হুশ বুদ্ধি ঠিক আছিল না তাই তোমারে ভক্তি দিতে ভুইলা গেছি। আসোলে তুমিই তো সব করছ। প্যারাসিটামল আর কুটি উছিলা মাত্র। তুমিই কুটির মন সদয় কইরা দিছো দেইখা সে প্যারাসিটামল আনছে। আর এই রোগের লাইগা তুমিইতো প্যারাসিটামল বানাইছ প্রভু। প্রভু আমার দোষে তুমি প্যারাসিটামল থাইকা তোমার আশীর্বাদ ফিরাইয়া নিও না। আমার পোলাডারে আবার অসুখে ফেইল না প্রভু

শিখু দাসের অনুনয়ে প্রভু যিশু হাসেন– আরে না। পাগলি কী কয় দেহ। আমি কিছু মনে করি নাই। তোর সাথে একটু মস্করা করলাম আমার কথা তোর মনে আছে কি না জিগাইয়া। ...তোর বিশ্বাস অত কম অইলে চলব কেমনে? তুই এইটা ভাবলি কী কইরা যে ঈশ্বরপুত্র যিশু তার এক সন্তানেরে একবার আশীর্বাদ কইরা আবার ফিরাইয়া নিবো? পোলার লাইগা তোর মাথা আউলা হইছে ঠিক। কিন্তু তুই এইডা কেমনে ভাবলি যে আমি তোর উপরে রাগ কইরা ডালিমরে আবার অসুখে ফালামু?
– মাপ কইরা দেও প্রভু। আমি গির্জায় একটা চাটাই দিমু
– আইচ্ছা যা। মাপ কইরা দিলাম। তয় খালি চাটাই দিলে হইব না। তোর পোলারে কইবি গির্জার উঠানের ঘাসগুলা যেন কোদাল দিয়া তুইলা দেয়
– হ প্রভু। কমু। আমি কমু। আর আমি নিজেও ঘাস তুলুম

প্রভু যিশু খুশি হয়ে আবার ছবি হয়ে যান আর ডালিমের মায়ের ঘুম ভাঙে ডালিমের চিৎকারে। ঘুম ভাঙতেই শিখু আবার ডালিমের গায়ে মাথায় হাত বোলাতে থাকে– যিশুরে ডাক বাবা। যিশুরে ডাক। ...ভাত খাবি? তোর নানির ঘর থাইকা নিয়া আহি? ...ইসরে গরম। মাথায় পানি দেই?

শিখু দাস ঘরের মধ্যে পানি খুঁজতে থাকে। জগ গ্লাস কলসি। কোথাও এক ফোঁটা পানি নেই

ডালিম আবার চুপ হয়ে যায় আর শিখুও ভুলে যায় সে কী খুঁজছিল। সে আবার ডালিমের বিছানায় বসে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়ে। তার আবার ঘুম ভাঙে যখন ডালিম আবার কাৎরায়। শিখু দাস আবারো ছেলের মাথায় গলায় বুকে হাত বোলাতে থাকে। অনেকক্ষণ হাত বুলিয়ে তার মনে হয় ডালিম কিছু খেতে চাইছে। সে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ায়। দূর থেকে একটু দেখে ছেলেকে– চা খাবি? তোর নানির ঘর থাইকা নিয়া আসি? তোর মামায়তো এখনও ওষুধ নিয়া আসলো না। খাড়া চা খাইলে জ্বর ছাড়ব
ডালিম চিৎকার করতে থাকে। শিখু দাস বের হতে থামে– পানি খাবি?

শিখু দাস আবার পানি খোঁজে। পায় না। অবশ্য একটু পরেই ভুলে যায় আসোলে সে কী খুঁজছে। ডালিম আবার চিৎকার করে। শিখু দাসের চোখ পড়ে হাতপাখায়। হাতপাখাটা নিয়ে ডালিমকে বাতাস করতে থাকে– ইস যা গরম। পোলাডা ঘুমাইব কেমনে? ঘুমা বাবা। ঘুমা। আমি তোরে বাতাস করতাছি। ঘুমা

বাতাস করতে করতেই তার চোখ পড়ে ঘরের একপাশে রাখা তেলের শিশির উপর। সে শিশি থেকে তেল নিয়ে ছেলের পায়ে মালিশ করতে থাকে। শিখু দাস তেল মালিশ করে আর বিড়বিড় করে– ঘুমা বাবা। ঘুমা। ও ডালিম যিশুরে ডাক। ঘুমা। তেল মালিশ দিতাছি আরাম পাবি। ছোটকালে তোরে কত তেল মালিশ দিছি আমি। আরাম পাবি বাবা। ঘুমা। তোর মামায় তোরে প্যারাসিটামল দিবো। হাসপাতালে নিবো। এখন ঘুমা। তোর মামা আইলেই তোরে ডাক দিমু। এখন ঘুমা

ছেলে আরাম পায় কি না বোঝা যায় না। সে সমানে গোঙাতে থাকে। শিখু দাসের তখন আবারও চায়ের কথা মনে হয়– ইসসিরে। চা না আনবার চাইছিলাম? সে এক দৌড়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায় চা আনার জন্য। মায়ের ঘরে

ডালিমের মা শিখু দাস যখন সত্যি সত্যি হাতে করে এক কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢোকে তখন ডালিম আবার ঘুমাচ্ছে। আর তার মাথার কাছে বসে কপালে হাত রেখে তাপ বোঝার চেষ্টা করছে ডালিমের বাবা ডেভিড অভয় দাস। শিখু স্বামীকে দেখে চায়ের কাপটা বাড়িয়ে দেয়– ডালিমের বাপ নেও চা খাও
– লাল চা?
– হ। চিনি পাই নাই। কুটির বৌ চিনি লুকাইয়া রাখে। খালি পাতি দিয়াই বানাইয়া আনছি। খাও

ডালিমের বাবা পাঞ্জাবির পকেট হাতড়িয়ে ছোট একটা পাউরুটি বের করে– এইটা রাখো

এইটা রাখো বলে পাউরুটিটা প্রথমে বিছানায় রাখে। তারপর নিজেই খুলে চায়ের মধ্যে ডুবিয়ে ডুবিয়ে খাওয়া শুরু করে। শিখু দাস দেখে ডালিম ঘুমাচ্ছে। ছেলেকে আবারও সে মাথায় বুকে হাত বোলায়– আর কোনো চিন্তা নাই বাবা। তোর বাবায় আইছে। তোরে হাসপাতালে নিবো
শিখু স্বামীর দিকে ফেরে– যাও না একটা রিকশা নিয়া আসো। ডালিমরে হাসপাতালে নিমু। যাও

ডেভিড অভয় দাস কিছুক্ষণ ছেলেকে দেখে। ...স্ত্রীর দিকে তাকায়। শিখু আবারও তাড়া দেয়। অভয় দাস ব্রেডটার অর্ধেক খেয়ে বাকিটা শিখুর হাতে দেয়– নেও রাখো। খুব টেস্টি বেরেড

অভয় দাস আরেকবার ছেলের কপালে হাত রেখে বেরিয়ে যায়। শিখু পেছন থেকে চিৎকার করে– ভাঙাচোরা রিকশা আইনো না। পোলাডায় চড়তে পারব না। দেইখা শুইনা একটা ভালো রিকশা আইনো

শিখু আবার ছেলেকে নিয়ে পড়ে– বেরেড খাবি ডালিম? খুব টেস্টি বেরেড। তোর বাবায় আনছে আর রিকশা ডাকতে গেছে। তোরে হাসপাতালে নিবো। নে চা দিয়া বেরেড খা

চায়ের কথা মনে হতেই চোখ পড়ে খালি কাপটার দিকে– দুরো। ডালিমের বাপের যুদি কোনো বুদ্ধিশুদ্ধি থাকে, পোলার লাইগা চা আনলাম সেই চা সে খাইয়া ফালাইল। দুর

শিখু দাস আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ে তার বিড়বিড়ানি আর ছেলেকে নিয়ে। হঠাৎ দরজা দিয়ে তাকিয়ে দেখে কুটি বাড়িতে ঢুকছে। সে দৌড়ে বের হয়ে আসে উঠানে– ও কুটি। ডালিমের বাপরে দেখছস?

কুটি বেশ অবাক হয়ে দাঁড়ায়– হেয় আসছে নাকি?
– আইছে তো
– টেকা পয়সা আনছে?
– না। একটা বেরেড আনছে
– দুই মাস পরে আসছে একটা বেরেড নিয়া। হেরে দেইখা আমার লাভ কী? কই গেছে এখন?
– ডালিমরে হাসপাতালে নিবো। রিকশা আনবার গেছে
– হেয় আনবো রিকশা? আবার পলাইছে সে
– তাইলে তুই একটু যা না ভাই। একটা রিকশা আইনা দে
– অখন আমার কাম আছে। পরে দেখুমনে

কুটি বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। শিখু দাস তার পথ আগলে দাঁড়ায়– প্যারাসিটামল আনছস?
– ভুইলা গেছি। কাইল আনুমনে

ডালিমের মা আকাশের দিকে তাকায়– ইস গরম। এই গরমে রিকশা পাইব কই? রিকশাওয়ালারা বাড়িতে ঘুমাইতাছে এখন

ডেভিড অভয় দাস রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। বিশালদেহী শরীরটা টেনে হাঁটতে থাকে বড়ো রাস্তা ধরে। পাশ দিয়ে যেতে যেতে প্যাসেঞ্জার নামানোর জন্য একটা বাস থামে। অভয় দাস উঠে পড়ে। ভাড়া না থাকার অপরাধে সিট থাকা সত্ত্বেও পুরো রাস্তা সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আসে কন্ডাকটরের ঝাড়ি খেয়ে। কন্ডাকটরটা বেশ ভালো। রাস্তায় নামিয়ে দেয়নি। বাস স্ট্যান্ডেই এনে নামায়। বাস স্ট্যান্ডে নেমে অভয় দাস পা বাড়ায় মিশনের দিকে। এক সময় এই মিশনটাই ছিল তার কর্মস্থল। আর চাকরি হারানোর পর যখনই তার থাকার কোনো জায়গা নেই তখন এই মিশনের বারান্দাই তার থাকার জায়গা। ফাদার অ্যানোস হাসদা আর অন্যরা সবাই তাকে চেনে। থাকলে কেউ আপত্তি করে না। মাঝে মধ্যে কেউ টুটাফাটা খাবারও দেয়। কারো সাথে অবশ্য তার খুব একটা কথা হয় না। বিশেষ করে মিশন ছাড়ার পর

ডেভিড অভয় দাস মিশনে গিয়ে সোজা ফাদারের রুমে ঢুকে পড়ে। ফাদার অ্যানোস হাসদা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। এটা তার অতি পরিচিত বৈশিষ্ট্য। তিনি যখন খুব ব্যস্ত না থাকেন তখন যে কারো সাথে কথা বলতে হলে হেঁটে হেঁটে বলেন। কারো সাথে কখনও তাকে কড়া করে কথা বলতে শোনেনি কেউ। ফাদার তাকে দেখে হাসিমুখে এগিয়ে আসেন– ডেভিড। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। অনেক দিন পর তোমাকে দেখলাম। অবশ্য আমরা না দেখলেও ঈশ্বর সব সময় আমাদের সবাইকেই দেখে রাখেন

– জ্বি ফাদার

ফাদার অ্যানোস হাসদা হাঁটতে হাঁটতে ঘর থেকে বের হয়ে আসেন। সামনের লম্বা বারান্দা দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটেন আর কথা বলেন। এটাও তার আরেকটা অভ্যাস। তিনি সবার সাথে ঘরে বসে কথা বলেন না। অভয় দাস যখন এখানে চাকরি করেছে তখনও দেখেছে। ফাদার অ্যানোস হাসদা কীভাবে কথা বলতে বলতে কাউকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসেন আর কীভাবে পেছনের দরজা হাত দিয়ে টেনে বন্ধ করে দেন। এবং এক সময়– আমি প্রার্থনা করব কিংবা আমার পড়ে থাকা কিছু কাজ রয়ে গেছে, সেগুলো এখনই না করলে ঈশ্বরের কাছে আমি দায়িত্বহীন হব বলে আবার নিজের ঘরে ঢুকে পড়েন অতিথিকে বাইরে রেখে

অভিজ্ঞতা থেকেই অভয় দাস বুঝে যায় ফাদার নিজের ঘরে তার সাথে কথা বলতে চান না। সেও বের হয়ে আসে ফাদারের সাথে। ফাদার সামনে হাঁটছেন। মাঝেমাঝে বারান্দার এগিয়ে আসা ফুল গাছের পাতায় একটু আধটু হাত বোলাচ্ছেন– এইসব গাছ– তৃণ কোনো কিছুই ঈশ্বরের নজরের বাইরে নয়। তিনি সব কিছুকেই ঠিক ঠিক নিয়মে পরিচালিত করেন
– জ্বি ফাদার
– ডেভিড তুমি কি আমাকে বিশেষ কিছু বলবে?

অভয় দাস কিছু বলে না। ফাদারের পেছন পেছন হাঁটে। ফাদার সরাসরি তাকান– কিছু বলতে হলে দ্বিধা না করেই বলো ডেভিড। ঈশ্বর মানুষের সমাজে বিভিন্ন স্তর তৈরি করেছেন পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে আসার জন্য। আমাকে যদি ঈশ্বর তোমার কোনো সাহায্যের সামর্থ্য না দেন তাহলে নিশ্চয়ই তিনি তোমার জন্য আরো সমর্থ কোনো মানুষ সৃষ্টি করেছেন এই বিশ্বজগতের কোথাও। এবং একমাত্র তিনিই জানেন তুমি কীভাবে তার কাছে যাবে আর তিনি কীভাবে তোমাকে ঈশ্বরের আদেশে সাহায্য করবেন
– জ্বি ফাদার
– বলো ডেভিড
– ফাদার রিকশা চালাইবার চেষ্টা করছিলাম কিছুদিন
– ঈশ্বর তোমাকে সুমতি দিন। কাজকর্ম করছ তাহলে?
– পারি নাই ফাদার। তারপরে এক জাগায় মাটি কাটার কাম নিছিলাম
– সদাপ্রভু যার জন্য যা নির্দিষ্ট করে রাখেন তাকে সেখানেই যেতে হয়। এটাই নিয়ম ডেভিড

ডেভিড অভয় দাস আবারও চুপ করে যায়। সে দুটো কাজের কথা বললেও মাঝখানে ইটের ভাঁটায় চৌকিদারি করার কথা ইচ্ছা করেই চেপে যায়

ফাদার হাঁটছেন। বোধ হয় এখন তার হাতে কোনো কাজ নেই। অথবা এখনও তিনি অভয় দাসের উপর বিরক্ত হয়ে উঠেননি। তাই এখনও হাঁটছেন। অভয় দাস ফাদারের পেছনে হাঁটতে হাঁটতে আগের কথার রেশ ধরে– ফাদার শক্ত কাম করবার পরি না
– ঈশ্বরের ইচ্ছায় তোমার জন্য নিশ্চয়ই অন্য কোনো কাজ রয়েছে ডেভিড। নিরাশ হয়ো না
– জ্বি ফাদার। ...শইলে দেয় না ফাদার। ফাদার...
– আমি শুনছি
– আপনের এখানে আমি তিন বছর পিওনের কাম করছি
– হ্যাঁ
– আমার চাকরিটা চইলা যায় ফাদার
– তোমার নিজের দোষেই তুমি চাকরিটা হারিয়েছ ডেভিড
– আমার বৌ আর একটা পোলা আছে ফাদার

– ঈশ্বর তাদের মঙ্গল করুন। তাদের প্রতি তোমার অনেক দায়িত্ব আছে। এখন তোমাকে আর আগের মতো অবিবেচক হয়ে চলবে না ডেভিড
– ফাদার। চাকরিটা আমারে আবার দেওন যায় না?
– সেখানেতো অনেক দিন ধরে আরেকজন কাজ করছে
– অন্য কোনো কাম দেওন যায় না ফাদার? যে কোনো কাম?
– যিশুকে স্মরণ করো। তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে একটা ভালো পথ দেখাবেন। তিনি যখন এখানে তোমার কর্মসংস্থান করবেন তখন নিশ্চয়ই তুমি তা পাবে। যোগাযোগ রেখো ডেভিড
– জ্বি ফাদার
– আর কিছু কি বলবে তুমি?
– না ফাদার
– ঈশ্বর তোমার আর তোমার পরিবারকে দেখে রাখুন। যিশুকে স্মরণ রেখো

ফাদার বারান্দায় হাঁটতে থাকেন। অভয় দাস ফিরে এসে বসে পেছনের বারান্দায়। মাথার নিচে হাত রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে মেঝেতে

আজ রোববার। বিষুদবারে ডালিমের বাপ রিকশা আনতে গিয়েছিল এখনও সে রিকশা পায়নি। কুটিও প্যারাসিটামল আনার কথা মনে করতে পারেনি এই কয় দিনে। সকালে উঠেই শিখুর মনে হয় এই পবিত্র দিনে যিশু কিছু একটা করবেন। অন্তত ডালিমের বাপকে একটা রিকশা পাইয়ে দেবেন অথবা কুটিকে মনে করিয়ে দেবেন ওষুধের কথা। বেশ খোশ মেজাজেই কথাগুলো সে ছেলেকে শোনায়। তার মনে হয় এই গির্জা দিনের সকালে এক কাপ চা খেলে ছেলের ভালো লাগবে। নির্ভুলভাবে সে কুটির ঘরে ঢুকে এক কাপ চা বানিয়ে এসে ছেলেকে ডাকে– আইজও চিনি পাইলাম না। নে গরম গরম খাইয়া ফালা। ...আইজ রবিবারতো। হগগলে গির্জায় গেছে। চা খাইতে খাইতে কুটি আইয়া পড়ব। খা

চা খাওয়ার ব্যাপারে ছেলের কোনো আগ্রহ না দেখে সে ছেলের পায়ে তেল মালিশ শুরু করে। তেলও নেই। শিশি উল্টে ঝাঁকান দিতে মাত্র দুয়েক ফোঁটা পড়ে হাতে। সেটুকু নিয়েই ছেলের দুপায়ের পাতায় মালিশ করতে থাকে– আইজ যিশুরে ডাকলে সে ফিরাইতে পারব না। তেল মালিশ দিতাছি পা গরম অইব

শিখুর মনে হয় যিশু তার কথা শুনেছেন। আজ ডালিমের শরীরে জ্বর নেই। যাক। এই গরমের দিনে ছেলেটা অন্তত আরামে ঘুমাতে পারবে। তার চোখ চায়ের কাপের দিকে যায়। চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। থাক। অতদিন পরে যখন ছেলেটার শরীর ঠান্ডা হলো তখন আর গরম চা খাইয়ে আবার গরম করে তোলার দরকার নেই। ঘুমাক। ঘুম থেকে উঠে ঠান্ডা চা-ই খাবে

ছেলের পায়ে তেল মালিশ করতে করতে তার মনে পড়ে চা বানাতে গিয়ে হাঁড়ির ঢাকনা সরিয়ে দেখে এসছে কুটির বৌ শিং মাছের ঝোল করেছে। বললে নিশ্চয়ই ডালিমের জন্য একটা মাছ দেবে। আচ্ছা তারা গির্জা থেকে ফিরুক। ডালিমের জন্য একটা মাছ নিয়ে আসবে সে

গির্জা থেকে ফিরে কুটি দরজা বন্ধ করে মাত্র খেতে বসেছে। দরজা ঠেলে হুড়মুড় করে ঘরে ঢোকে শিখু। কুটির বৌ বেশ বিরক্ত হয়। বিয়ের সময় এরা কেউই বলেনি যে তাদের এক বোন পাগল। নাহলে কিছুতেই তার বাপ এমন ঘরে মেয়ে বিয়ে দিত না। শুধু বোন হলেও এক কথা ছিল, বোনের জামাইটাও বেদিশা। কিন্তু কুটির জন্য কিছু বলারও উপায় নেই। না বললেও এইসব ঝামেলা আর কাঁহাতক সহ্য করা যায়। শিখুকে দেখে কুটির বৌ অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় আর কুটি বলে উঠে– আইজ আর ভুলুম না। আইজ বিকালেই ওষুধ আইনা দিমু
– ওষুধ লাগবো না। তুই একটু আয় ভাই

– খাইতাছি তো। কী হইছে আবার?
– আমার ডালিম কথা কয় না
– হেয় তো আইজ এক মাস ধইরাই কথা কয় না। এইডা আবার নতুন কী?
– শব্দ করে তো
– ঘুমাইতাছে। ঘুম ভাঙলে শব্দ করব নে
– নারে ভাই কুটি। তুই একটু আয়। পরে আইসা খাবি। আয়
– জ্বালাইয়া মারলা তোমরা। আসো দেখি কী হইছে

কুটি হাত ধুয়ে উঠে পড়ে। বৌকে বলে– চাইকা রাখো আসতাছি

শিখু দাসের আগে আগে এসে ঢোকে ডালিমের ঘরে। ঘরটা দুর্গন্ধ। ডালিম শুয়ে আছে কাঁথার নিচে। তেল মালিশের জন্য তার মা পায়ের দিকে যে অংশটি থেকে কাঁথা সরিয়েছিল সেটি সেভাবেই আছে। কুটি মুখের দিকে কাঁথা সরিয়ে ডালিমের কপালে হাত দেয়। তারপর বোনের দিকে ফেরে– আসো। তুমি আমার লগে আসো

শিখু দাস কুটির সাথে বের হয়ে আসে। কুটি চাটাইয়ের দরজাটা টেনে বন্ধ করে দেয়। শিখুকে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে বৌকে বলে– এরে ভাত দেও। ওই ঘরে আর যাইতে দিবা না। আমি গির্জায় যাইতাছি
– গির্জায় ডাক্তার আছে?
– না ফাদাররে ডাকতে অইব

বৌকে কানে কানে কিছু একটা বলে শার্ট গায়ে দিয়ে কুটি বের হয়ে যায়। যাবার আগে শিখুকে বলে যায় ডালিম ঘুমাক। সে যেন সেই ঘরে আর না যায়। কিন্তু কুটি বের হতে না হতেই আস্তে করে কুটির ঘর থেকে বেরিয়ে শিখু ঢুকে পড়ে নিজের ঘরে। ...ডালিম ঘুমাচ্ছে অঘোরে। শিখু দাস বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। কুটি বেরোবার আগে ডালিমের মুখ কাঁথা দিয়ে ঢেকে দিয়েছিল। শিখু মুখের কাঁথা সরায়। মাথায় হাত দেয়। জ্বর নেই। শিখু ছেলের মাথায় গলায় বুকে হাত বুলিয়ে বিড়বিড় করে– তোর মামায় গির্জায় গেছে। ফাদাররে নিয়া আইব। আইজ রবিবার। আইজ ফাদার আইসা তোর লাইগা যিশুরে কইলে যিশু তার কথা শুনবেন

ডালিমের মা শিখু দাস এই এক মাসে যতটুকু ঘুমিয়েছে তা সবই ছেলের যত্ন করতে করতে ছেলের উপর পড়ে গিয়ে। সেই ঘটনা এখনও ঘটল। সে ঘুমিয়ে পড়ল ডালিমের উপর। ঘুমিয়েই স্বপ্ন দেখতে শুরু করে শিখু দাস, কুটি তাদের গ্রামের গির্জার ফাদার প্যাট্রিক ডি
কস্তাকে নিয়ে এসে ঘরে ঢুকেছে। ফাদার এসেই তার দিকে তাকিয়ে বলছেন– আর কোনো চিন্তা নাই দিদি। প্রভু যিশুর ইচ্ছায় আজকের এই পবিত্র দিনেই তোমার পোলা সুস্থ হইব। তুমি সরো। আমি যিশুর নামে তার শইলে একটু হাত বুলাই

এই বলেই ফাদার প্যাট্রিক ঘরের বেড়াতে ঝোলানো যিশুর ছবির সামনে ক্রুশ করে ডালিমের দিকে এগিয়ে যান– বাবা ডালিম। প্রভু যিশুর ইচ্ছায় আইজ আমি তোমার ঘরে আসছি তার মঙ্গল বার্তা নিয়া। প্রভু বলেছেন তুমি সুস্থ হইয়া উঠবা। আগামী রবিবারের গির্জায় তিনি সবার লগে তোমারেও দেখতে চান। তাই তিনি আমারে পাঠাইছেন তোমারে এই আনন্দ বার্তা পৌঁছাইয়া দিতে। ডালিম। ডালিম আব্রাহাম দাস। চোখ খোলো। উইঠা বসো। তোমার মা চিন্তিত আছেন তোমারে নিয়া। উইঠা বসো ডালিম আব্রাহাম দাস

ফাদার প্যাট্রিক ডি কস্তা ডালিমকে ডাকেন আর কাঁথা সরিয়ে শরীরে হাত বোলাতে থাকেন। শিখু কুটির সাথে দাঁড়িয়ে থাকে বেড়ার পাশে। তারা দেখে ডালিমের মুখ থেকে এত দিনের অসুস্থতার সব চিহ্ন আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে। ডালিম ঘুমের মধ্যে হাসছে। এটা তার অভ্যাস। ছোট বেলায় ঘুমের মধ্যে শব্দ করেই হাসতো ডালিম। বড়ো হবার

পরে আর শব্দ করে না। মুচকি হাসে। কিন্তু সে অনেক জোরে জোরে কথা বলে ঘুমের মধ্যে। কতদিন শিখু ঘুম ভেঙে কুপি জ্বালিয়ে বিছানার কাছে গিয়ে দেখেছে ডালিম ঘুমাচ্ছে। অথচ তার শব্দেই শিখুর ঘুম ভেঙে গেছে

শিখু দাস দেখে ফাদার ডালিমের সারা শরীরে হাত বোলানো শেষে আবার যিশুর ছবির দিকে তাকিয়ে ক্রুশ করেন। তারপর ডালিমের বুকে ক্রুশ করেন ফাদার। কয়েকবার। প্রতিবারই আস্তে আস্তে বলতে থাকেন– হে প্রভু তুমি আমাগো ডালিম আব্রাহাম দাসেরে কৃপা করো যেন সে আমাগো লগে তোমার এবং তোমার প্রিয় পুত্রের প্রশংসা করবার পারে। তুমি আমাদিগকে এবং আমাদিগো ডালিমেরে কৃপা করো প্রভু

ফাদার কয়েকবার ডালিমের বুকে ক্রুশ করে– সদাপ্রভু আমাগো ডালিমের প্রতি সদয় হোন বলে আস্তে আস্তে হাত রাখেন ডালিমের চোখের উপর– পুত্র ডালিম আব্রাহাম দাস। পিতা-পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তোমার চোখ খোলো

ফাদার কথাটা বলে ডালিমের চোখের উপর থেকে হাত সরাতেই ডালিম আস্তে করে দুই চোখ খুলে তাকায় ফাদার আর ঘরের সবার দিকে। তার দিকে তাকিয়ে খুশি হয়ে উঠেন ফাদার। হাসেন– প্রভুরে স্মরণ কইরা এইবার উইঠা বসো ডালিম

ফাদার ডালিমের একটা হাত ধরেন। ডালিম ফাদারের হাত ধরে বিছানায় উঠে বসে
– ঈশ্বরের অসীম করুণা। এইবার দুই পায়ে খাড়াও পুত

এবার আর ফাদারকে ধরতে হয় না। ডালিম নিজে থেকেই উঠে দাঁড়ায়। একেবারে বিছানার উপর। তার মাথা গিয়ে ঘরের চালে লাগে। ফাদার আবারও দেয়ালে যিশুর ছবির দিকে তাকিয়ে ক্রুশ করেন– প্রভুরে ধন্যবাদ। প্রভুর কৃপায় আমাগো ডালিম আইজ রোগমুক্ত হইছে। ...প্রভুরে কৃতজ্ঞতা জানাও ডালিম

কিন্তু ডালিম কিছুই করে না। লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে এক দৌড়ে বের হয়ে যায় ঘর থেকে। শিখু ডাকতে ডাকতে পেছনে ছোটে। ফাদার প্যাট্রিক তাকে আটকান– যাইতে দেও দিদি। ছেলে মানুষ। অনেকদিন ঘরে বন্দী আছিল। প্রভু তারে আবারও বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা দিছেন। যাইতে দেও। প্রভুর কৃপা অসীম। আসো আমরা প্রভুরে কৃতজ্ঞতা জানাই

শিখু আর কুটি ফাদারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রুশ করে কৃতজ্ঞতা জানাতে যাবে এমন সময় পেছন থেকে কুটির চিৎকারে ঘুম ভেঙে যায় শিখু দাসের– তোমারে না কইলাম এই ঘরে ঢুকবা না? যাও বাইরে যাও

শিখু দেখে কুটি দাঁড়িয়ে আছে পেছনে। আর তার সাথে গ্রামের গির্জার ফাদার প্যাট্রিক ডি
কস্তা। যিনি একটু আগেই স্বপ্নে প্রভু যিশুর ইচ্ছায় ডালিমকে সুস্থ করেছেন। ফাদারকে দেখেই শিখু ছেলের মুখ থেকে কাঁথা সরিয়ে ডাকে– ও ডালিম। উঠ বাপ। দেখ কে আইছে। তোর আর কোনো চিন্তা নাই
কুটি ধমকে ওঠে– কী করো এইডা? তুমি সরো। বাইরে যাও
– ক্যান আমার পোলারে রাইখা আমি যামু কেন?

ফাদার হাতের ইশারায় কুটিকে থামিয়ে শিখুর দিকে এগিয়ে যান– আমারে একটু দেখতে দেও দিদি
শিখু সরে আসে বিছানার কাছ থেকে। এর মধ্যে কুটির বৌ আর মা এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে। কুটি তাদের দিকে ফিরে– এরে বাইরে নিয়া যাওতো
কুটির বৌ আর মা শিখু দাসকে টেনে বাইরে বের করতে না করতেই নজরুলের গলা শোনা যায়– কুটি দা আছ?
– কেডা?
– আমি নজরুল। একটু বাইরে আসোতো

নজরুল কুটির বয়সে ছোট হলেও গ্রামের উঠতি নেতা। সামনের ইলেকশনে চেয়ারম্যানিতে দাঁড়াবে। বয়স কম হলেও সে এলাকায় নিজেকে প্রমাণ করে নিয়েছে

কুটি বাইরে এসে দাঁড়ায়– তুমি কই থাইকা?

নজরুলের সাথে আরো কয়েকটা ছেলে। কুটির কেমন সন্দেহ হয়। ঝামেলা এড়াতে সে সোজা বলে– আমার ভাইগ্না পোলাডা গত রাতে মারা গেছে। সেইডা নিয়া টেনশনে আছি নজরুল। কও কী খবর?
– এই খবরডা শুইনাই আইলাম
– ভালা করছ। বিপদে আপদে তো তোমরাই ভরসা। পোলাডার মা পাগল আর বাবা একটা বেদিশা মানুষ। তোমরা আছ বইলাই না সাহস পাই

নজরুল হাসে– অবশ্যই। গ্রামের কোনখানে কী হইতাছে আর কোনখানে কী দরকার তা যদি খবর নাই নিলাম তয় সমাজে থাকনের দরকারটা কী?
– ঠিকই কইছো। ...তোমরা বসো। আমি ফাদারের লগে আলাপ কইরা পোলাডার কী ব্যবস্থা করা যায় দেখি
– তা তো করবাই। তুমি হইতাছ পোলার মামা। আইনগত গার্জিয়ান। কিন্তু কুটি দা...
– কী?
– ফাদাররে চইলা যাইতে কও
– ক্যান?
– তোমার ভাইগ্নার কবর আমরা মুসলমান নিয়মে দিমু
– ক্যান? আমি খিরিস্টান। আমার ভাইগ্নাও খিরিস্টান। ওর কবর মুসলমান নিয়মে হইব কেন?
– তুমি খিরিস্টান ঠিক আছ। কিন্তু তোমার ভাইগ্না মুসলমান। হের বাপে হের মা আর তারে লইয়া মুসলমান হইছে
– তোমারে কইছে কেডায়?
– সেইটা কোনো বিষয় না। একটা মুসলমানরে তুমি খিরিস্টান নিয়মে করব দিতে পারো না। এইটাই আসোল কথা

কুটি আমতা আমতা করে– দ্যাখো নজরুল। আমরা নিরীহ মানুষ। কারো সাথে কোনো ভেজালে নাই। আমার ভাইগ্নাটা মরছে। তারে আমাগো মতো কবর দিবার দেও
– তোমার ভাইগ্না সেইডাতো কেউ অস্বীকার যাইতাছে না। কিন্তু সে মুসলমান। তার দাফনের ব্যবস্থা আমরাই আমাগো নিয়মে করুম। এইডা সাফ কথা

আস্তে আস্তে লোক জমে যায়। নজরুল সবার কাছে ডালিমের বাবার ছেলে এবং বৌসহ কলেমা পড়ার কাহিনী বয়ান করে। সমর্থন নজরুলের দিকে আর চাপ কুটির দিকে বাড়তে থাকে। কুটি একটু দূরে গিয়ে ফাদারের সাথে কানে কানে কিছু কথা বলে। ফাদার প্যাট্রিক ডি কস্তা এগিয়ে আসেন– আপনেরা যা ভাবতাছেন তা ঠিক না। আমরা সবাই জানি ডেভিড অভয় দাসের পোলা ডালিম আব্রাহাম দাস ক্যাথলিক খ্রিস্টান। তার কোনোভাবেই মুসলিম হওয়ার কোনো কারণ নাই। তার আত্মীয় স্বজন সবাই খ্রিস্টান
– ওর মায়েরে ডাকেন। তারে জিগান ডালিমের বাপে বৌ-পোলা নিয়া মুসলমান হইছে কি না
শিখুর প্রসঙ্গ আসতেই কুটি বাধা দেয়– হের মাথার ঠিক নাই হগগলেই জানে। হেয় কী কইব?
– বেঠিক মাথা নিয়াও মুসলমান হইতে বাধা নাই। মুসলমানগো মইধ্যেও পাগল আছে

শিখু দাস দৌড়ে এসে কুটির হাতে ধরে– ও কুটি। কুটি আমার কথা শোন ভাই
– তুমি ঘরে যাও
– শোন না। একটা কথা শুন

– কী? কও
– কাইজা করিস না ভাই
– হইছে। তোমারে আর পণ্ডিতি করা লাগব না। ঘরে যাও

কুটির বাবা প্রমোদ বিশ্বাস লাঠি ভর করে নজরুলের সামনে গিয়ে দাঁড়ান– শোনো ভাতিজা। তোমাগো এই মুসলমানগো গ্রামে আমরা কয়েক ঘর খ্রিস্টান। বাপ দাদার আমল থাইকা বসবাস কইরা আসছি তোমাগো বাপ দাদার লগে। কোনোদিন মুসলমান আর খ্রিস্টানের মাঝে কোনো ঝামেলা হয় নাই

নজরুল প্রমোদ বিশ্বাসের কথা বেশ সম্মানের সাথে শোনে। তারপর খুব বিনীতভাবে বলে– কাকা। আমরাও আপনাগো সাথে মিলা-মিশাইতো বড়ো হইলাম। আপনারা খিরিস্টান বইলা কোনোদিন কি কোনো বেয়াদবি করছি আপনার লগে?

প্রমোদ বিশ্বাস মাথা নাড়ে– না। কোনোদিন না। তোমার বাবা এখনও আমারে দেখলে দাদা বইলা ভালো মন্দ জিগায়
– হ কাকা। মানুষরে তার যোগ্য সম্মান দেওয়া আমারে আমার পরিবার শিখাইছে। আমাগো ধর্মেও আছে সেই কথা। না হইলে আপনারা মাত্র কয়েক ঘর খিরিস্টান। ঝামেলা করতে চাইলে কীই বা করতে পারতেন আপনারা? আমরা ঝামেলায় নাই কাকা
– আমরাও নাই ভাতিজা। আমরা নিরীহ মানুষ
– হ কাকা। কিন্তু আপনার নাতিতো মুসলমান
– কথাটা ঠিক না ভাতিজা। আমার নাতি ক্যাথলিক খ্রিস্টান
– ক্যাথলিক না কি সেইটা জানি না। তয় হেয় খিরিস্টান আছিল। কিন্তু আপনার জামাই আপনার মাইয়া আর নাতিরে লইয়া মুসলমান হইছে কাকা
কুটি এবার এগিয়ে আসে– এর কোনো প্রমাণ আছে তোমার কাছে?
– পোলার মারে জিগাও
– এর মাথার ঠিক নাই। এ আবার কী কইব?
– তাইলে পোলার বাপেরে আনো। তারে জিগাইলেই বাইর অইব
– তারে আমি পামু কই? তার কি কোনো ঠিক-ঠিকানা আছে?

নজরুল আবারও হাসে। তোমার কিছু করতে হইব না কুটি দা। পোলার বাপরে খুঁজতে লোক পাঠাইছি আমি। হেয় আসলেই মীমাংসা হইব

প্রমোদ বিশ্বাস এগিয়ে আসে আবার– কিন্তু ভাতিজা। ধরো তারে পাওয়া গেলো না। অথবা তার আসতে দেরি হইল। তখন কিন্তু লাশে পচন ধরব। গরমের দিন
– কিছু করার নাই কাকা। আপনার নাতি। আপনি যদি তারে দাফনের অনুমতি দেন তাইলে আমরা অখনই জানাজা কইরা দাফন করতে পারি। কিন্তু আপনারা বাধা দিলে তো মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত লাশ এইভাবেই থাকতে অইব

নজরুল ফাদারের দিকে তাকায়– আপনে সম্মানিত মানুষ। আপনে এইসবের মইধ্যে না আসাই ভালো। পোলার বাপে আসুক। তার আগে পর্যন্ত আমাগো লোক থাকব। লাশেরে নিয়া আপনারা কিছু চিন্তা কইরেন না। মীমাংসা হইবার পরে যদি দেখা যায় সে আপনাগো ধর্মের লোক তাইলে যা করার কইরেন

শিখু দাস আবারও দৌড়ে আসে– ও কুটি। কুটি। তোর কোনো বুদ্ধিশুদ্ধি নাই? এই রইদের মইধ্যে সবাইরে খাড়া করাইয়া রাখছস? যা হেগোরে নিয়া ঘরে গিয়া বস

কুটি তার কথার কোনো উত্তর দেয় না। নজরুল পাশের জনের দিকে তাকায়– আহারে মানুষটা। নিজের পেটের পোলা নাই সেইডা সে কইতেও পারে না। আর আমাগো মাথায় রইদ লাগে হেইডা লইয়া পেরেশান

কুটির মা শিখুকে টেনে নিয়ে যায়। নজরুল এগিয়ে যায় প্রমোদ বিশ্বাসের দিকে– কাকা। আপনেরে যেমন কাকা বইলা ডাকি সেইরকম সম্মান করতে চাই যতদিন বাঁচি। এইখানে একটা ঝামেলা ঘটছে। কারোই কিছু করার নাই। আমি অখন যাইতাছি। কিছু কাম আছে আমার। তয় আপনেরে কইয়া যাই কাকা। লাশডা যেমন আছে তেমনই যেন থাকে। হের বাপ আসলে পরে যা করার করা যাইব। আপনি ইচ্ছা করলে তখন ফাদাররেও আসতে কইতে পারেন। তিনি নিজের কানে শুনবেন সব

নজরুল তার লোকজনকে কানে কানে কিছু বলে বের হয়ে যায়। পেছন থেকে শিখু দৌড়ে আসে– ও নজরুল চা খাইলি না? খালি মুখে যায় নি? খাড়া চা বহাই
– না দিদি পরে আরেকদিন খামুনে। একটু কাম আছে। যাই

নজরুল যতই কাকা বলে সম্মান দেখাক না কেন। প্রমোদ বিশ্বাস বুঝতে পারে ঝামেলা কোথায় গড়াচ্ছে। নজরুল নিজে চলে গেলেও বাড়ির সামনে লোক বসিয়ে রেখে গেছে। তাদের বাইপাস করে কিছু করা সম্ভব নয়। ফাদার বাইরের লোক। তিনি নিজে থেকে কিছু করতে নারাজ। তিনি পরামর্শ দিলেন মিশনে ফোন করতে। সেখান থেকে যদি ফাদার অ্যানোস হাসদা কোনো লোক পাঠান তাহলে একটা মীমাংসা করা যাবে। তবে নজরুলের লোক অভয় দাসকে পাবার আগেই যদি অভয়কে বুঝিয়ে ফেলা যায় তাহলে হয়ত ঝামেলার একটা সমাধান হলেও হতে পারে। কিন্তু তাকে পাওয়াও তো একটা কাজ

শিখু বিশ্বাসের খেয়াল হয় এই ঝামেলার মধ্যে ছেলের খোঁজ নেয়া হচ্ছে না অনেকক্ষণ। সে গিয়ে হাজির হয় ডালিমের ঘরে। ডালিম ঘুমুচেছ। মুখের কাঁথা সরিয়ে ছেলের মাথায় গলায় বুকে হাত দিয়ে দেখে জ্বর নেই। হয়ত প্রভু যিশু কৃপা করেছেন। জ্বরটা ছেড়ে গেছে। সে তেলের শিশিটা উপুড় করে হাতে। কয়েক ফোঁটা পড়ে। ডালিমের পায়ের কাঁথা সরিয়ে মালিশ করতে থাকে– ঘুমাক। অনেকদিন পোলাটা ভালো করে ঘুমাতে পারে না। পায়ে তেল মালিশ দিলে ঘুম আরো ভালো করে আসবে। ঘুমাক

পেছন থেকে খ্যাঁকিয়ে উঠে কুটি– ফ্যাসাদের মইধ্যে ফ্যাসাদ। এইডা আবার কী করো তুমি? সরো। বাইরে যাও
কুটির সাথে কুটির মাও ঢোকে ঘরে। ডালিমের মা তার কাজ করেই যাচ্ছে। কুটি আবারও তাকে বের করে দিতে গেলে সে বিগড়ে যায়– কেডা তুই? তুই কেডা? আমার ঘর থাইকা আমি বাইরামু ক্যান?
কুটি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু কুটির মা তাকে থামায়– থাউক। সে তার পোলার লগেই থাউক। এখনও কিছু বুঝে নাই। বুঝলে আবার ওরে সামলাইব কেডায়?

কথাটায় যুক্তি আছে। ঠিকইতো। বাইরের ঝামেলা সামলানোই এখন কঠিন। তার উপর যদি পাগল সামলাতে হয়। তার চেয়ে থাকুক সে তার মতো। সময়মতো যা করার করা যাবে। ...কুটি বের হয়ে আসবে এমন সময় শিখু ডেকে থামায়– ও কুটি। কুটি
– কী আবার?
– তোর বৌরে কইবি একটু চিনি বাইর কইরা দিতে?
– চিনি?
– হ। পোলাডারে একটু চা বানাইয়া দিমু। হেয় আবার চিনি ছাড়া চা খাইতে পারে না
কুটি তার মায়ের দিকে তাকায়। কী বলবে বুঝে পায় না। শিখু দাস আবারও পীড়াপীড়ি করে– ক না ভাই। এক চামচের বেশি নিমু না। খালি পোলাডার লাইগা এক কাপ চা
– ঠিক আছে কমুনে

– এখনই কইয়া দে

কুটির সাথে সাথে শিখু দাসও বের হয়ে আসে ঘর থেকে। যতক্ষণ না কুটি তার বৌকে চিনি বের করে দিতে বলেছে ততক্ষণ লেগে থাকে পেছনে। তারপর পরম নিশ্চিন্তে চা বানাতে চলে যায় শিখু

নজরুলের লোক যখন ডেভিড অভয় দাসকে খুঁজে বের করে তখন সে শহরের মিশনের পেছনের বারান্দায় বিড়ি ফুঁকতে ফুকতে কার কাছে যেন কোন দেশের কোন সেনাপতির গল্প শুনছিল। খবরটা তাকে খুব একটা নাড়া দেয় বলে মনে হয় না। সে সোজা উঠে দাঁড়ায়। সংবাদদাতাকে জিজ্ঞেস করে গাড়ি ভাড়া আছে কি না। কিন্তু শ্বশুর বাড়ির কাছে এসে জানতে পারে তাকে আনিয়েছে নজরুল। এবং ছেলের লাশ দেখতে নয়। লাশের ধর্ম ঠিক করতে

অভয় দাস কথা একেবারেই কম বলে। নজরুলের জেরার মুখে শুধু বলে– ধর্ম তোমরা একটা ঠিক কইরা লইও। আমি একটু পোলাডারে দেখবার চাই

ডেভিড অভয় দাস যখন শিখু দাসের বাড়ি পৌছায় তখনও শিখু দাস ছেলের ঘরে। চায়ের কাপ ছেলের মুখের কাছে নিয়ে ছেলেকে ডাকছে। স্বামীকে দেখেই সে খুশি হয়ে উঠে– ডালিমের জ্বর কমছে
অভয় দাস আস্তে আস্তে ছেলেকে দেখে। এর মধ্যে এসে ঢোকে কুটি। তাকে টেনে বের করে নিয়ে যায় ঘর থেকে। বাইরে তখন বেশ ক'জন লোক আর হুজুরকে নিয়ে নজরুল হাজির হয়ে গেছে। কুটিকে বের হতে দেখেই নজরুল এগিয়ে আসে– পোলার বাপ যখন আসছে তখন আর দেরি কইরা কী লাভ?

ডেভিড অভয় দাস কিছু একটা বলতে যাচিছল কিন্তু কুটি থামিয়ে দেয়– এখন কিছু করা যাইব না নজরুল। তোমরা তোমাগো লোক নিয়া আইছ। আমরাও মিশনে খবর পাঠাইছি। মিশন থাইকা লোক না আসা পর্যন্ত কোনো সালিশ করা যাইব না
– সালিশের কী আছে? ডালিমের বাপে কইলেই অইব
– না হেয় কিছু কইব না। মিশনের লোক না আসা পর্যন্ত তোমরা কেউ তার লগে কথা কইতে পারবা না

কুটি অভয় দাসকে তার ঘরে নিয়ে বসিয়ে রাখে। নিষেধ করে দেয় কারো সাথে কোনো কথা বলতে। কিন্তু সে বের হয়ে আসতেই নজরুল জানায় ডালিমের বাবা যার মাধ্যমে ছেলে আর বৌ নিয়ে মুসলিম হয়েছে সেই ইট ভাঁটার মালিককেও দরকার হলে আনা হবে। ডালিমের বাপ যদি অস্বীকার করে তবে তার না আসা পর্যন্ত লাশ দাফন বন্ধ থাকবে

সালিশ বসতে বসতে রাত হয়ে যায়। নজরুলের পক্ষে লাশ দাফনের ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে। কুটির পক্ষেও তাই। মিশন থেকে ফাদার অ্যানোস হাসদা প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন তিনজন। একপাশে নজরুলের লোক আর অন্যপাশে কুটির আত্মীয় স্বজন– ফাদার প্যাট্রিক এবং মিশনের প্রতিনিধিরা। ডালিমের বাবা দুপক্ষের মাঝখানে আর মা ঘুরে বেড়াচ্ছে চারপাশে। মাঝেমাঝে এক দৌড়ে ডালিমকে দেখে আবার চলে আসছে। আবার যাচ্ছে। একবার তাকে জগে করে পানি নিয়ে ঘরে ঢুকতে দেখে কুটি ক্ষেপে উঠে– তুমি আবার পানি দিয়া কী করো?
– ডালিমের শইল থাইকা গন্ধ বাইরাইতাছে। একটু মুইছা দেই

কুটি তাকে থামাতে গেলে দুই পক্ষই কুটিকে থামিয়ে দেয়– যাউক। মাথা ঠিক নাই মানুষডার। পোলায় মরছে এখনও কইতে পারে না। করতে দেও

ডালিমের বাবাকে একপক্ষ ডাকছে ডেভিড অভয় দাস আরেক পক্ষ বলছে মোহাম্মদ দাউদ আলী। দুটোর উত্তরেই সে তাকাচ্ছে প্রশ্নকর্তার দিকে। কিন্তু এখনও বলেনি কিছু। এখন পর্যন্ত তর্ক চলছে নজরুল– নজরুলের পক্ষ এবং মিশনপক্ষের মাঝে

মিশন পক্ষের যুক্তি হচ্ছে কাউকে লোভ দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করলে সেটাকে ধর্মান্তর বলা যায় না। ডেভিড অভয় দাসকে ইট ভাঁটার মালিক চাকরির বিনিময়ে কলেমা পড়িয়েছিল। সুতরাং সেটাকে ধর্মান্তর বলা ঠিক হবে না। তাছাড়া ডালিমের বাবা এখনও মিশনে থাকে এবং রোববারে গির্জা করে

অন্যপক্ষের যুক্তি হচ্ছে বাংলাদেশে যত খ্রিস্টান তার বেশিরভাগই হয় লোভে পড়ে হয়েছে না হয় বাধ্য হয়ে হয়েছে। ধর্মান্তরিত হবার প্রক্রিয়া দিয়ে ধর্ম বিচার করলে বাংলাদেশের কোনো খ্রিস্টানই আর খ্রিস্টান থাকে না। সুতরাং কে কীভাবে ধর্ম চেঞ্জ করল সেটা কোনো বিষয় না। বিষয়টা হলো সে ধর্ম চেঞ্জ করেছে কি না। অভয় দাস কীভাবে বৌ বাচ্চা নিয়ে কলেমা পড়ল সেটাও এখানে বিষয় না। বিষয় হচ্ছে সে কলেমা পড়ে মোহাম্মদ দাউদ আলী হয়েছে কি না। যদি সে কলেমা পড়ার পরও গির্জায় যায় তবে তার জন্য কাফফারা আছে– তওবা আছে। তার মানে এই নয় যে সে আবার খ্রিস্টান হয়ে গেলো

ডেভিড অভয় দাস ওরফে দাউদ আলী বলছে না কিছুই। কিন্তু শিখু দাসকে অনেকক্ষণ ডালিমের ঘর থেকে বের হতে না দেখে অনেকেরই সন্দেহ হয়। নজরুল উঠে– দেইখা আসি দিদি আবার মুর্দার কাছে কী করে
কুটিও উঠে যায়। নজরুল না আবার দিদিরে ধুনফুন কিছু বুঝাইয়া ফালায় একা পাইয়া

দুজন যখন ডালিমের ঘরে পৌঁছায় তখন শিখু আঁচল ভিজিয়ে ছেলের বুক মুছিয়ে দিচ্ছে। কুটি আর নজরুল দুজন দুজনের দিকে তাকায়। নজরুল কুটির পিঠে হাত রাখে– যাই হউক কুটি দা। দিদিরে মনে হয় এই ঘরে রাখা ঠিক না
কুটিও একমত। দুজন এগিয়ে গিয়ে শিখুকে তাদের সাথে বের হয়ে আসতে বলে। শিখু রাজি না– গন্ধ বাইরাইতাছে তো। শইলডা মুইছা দেই
– লাগব না দিদি। আমরাই ওরে গোসল করামু
– বেক্কলের মতো কথা কস দেখি। জ্বরের মইধ্যে গোসল করব কেমনে?
– এখনতো জ্বর নাই

কথাটা ঠিক। শিখু দাসের মনে ধরে। নজরুল আর কুটির সাথে সে বেরিয়ে এসে দাঁড়ায় অভয় দাসের পেছনে। হাতে ধরে টানতে থাকে– ও ডালিমের বাপ দেখো আইসা ডালিমের শইল থাইকা গন্ধ বাইরাইতাছে
ডালিমের বাপ হাত ছাড়াতে পারে না। ফাদার প্যাট্রিক শিখু দাসকে বোঝানোর চেষ্টা করেন– দিদি তুমি ঘরে যাও। চিন্তা কইরো না। তোমার পোলারে গোসল দিয়া আমরা মাটি দিমু
– মাটি দিবেন? তাইলে দিয়া ফালান

সবাই সবার মুখের দিকে তাকায়। শিখু দাসও তাকায় সবার দিকে। নজরুলকে তার মনে ধরে– নজরুল। তোর লগে তো মেলা লোক। তুই আমার পোলাডারে মাটি দিবার পারস না?
নজরুল কোনো উত্তর খুঁজে পায় না। কুটি খ্যাঁকিয়ে উঠে– যেই মাটি দেউক। তোমারে তা নিয়া মাথা না ঘামাইলেও চলব। যাও ঘরে যাও
– আমি দেইখা আইলাম গন্ধা বাইর অইতাছে। আমার কথায় বিশ্বাস যায় না। উল্টা গরম দেখায়
নজরুল এবার সরব হয়– থাউক কুটি দা। মাথা ঠিক নাই। তার লগে এমন করা ঠিক না। ...তুমি চিন্তা কইরো না দিদি আমরা আছি
– আছি তা বুঝুম কেমনে? আমার পোলাডারে মাটি দিলেই পারস

– হ দিদি। আমরা তো হের লাইগাই আইছি। কিন্তু তার আগে যে ঠিক করা লাগে তোমার পোলা খিরিস্টান না মুসলমান
– আমার পোলা ডালিম
আরেক বিপদ। কুটি নজরুলের দিকে ফিরে– এর লগে কথা কইয়া লাভ নাই। ভেজালটা তুমিই বাধাইছ
– আমি আবার কী ভেজাল করলাম? তোমরা একটা মুসলমানরে খিরিস্টান বানাইয়া কবর দিবা। আমরা বুড়া আঙুল চুষুম?

হুজুর নজরুল আর কুটিকে থামান। শিখু দাস আস্তে করে আবার বেরিয়ে যায় মিটিং থেকে। হুজুর রেগে উঠেন অভয় দাসের উপর। এই লোকটার হাতেই সমাধান– আমি তোমারে সোজাসুজি কিছু কথা জিগাই মিয়া। সোজা উত্তর দিবা
ডেভিড অভয় দাস তার দিকে তাকায়
– তুমি কি মুসলমান না খিরিস্টান?
– খিরিস্টান
কুটি উত্তর দেয়। নজরুল বাধা দিয়ে উঠে– তারে কইতে দেও। তোমারে জিগাইছে কেডায়?
হুজুর আবার অভয় দাসের দিকে ফিরেন– তুমি কও মিয়া। তোমার মুখে জবান নাই?
– কী কমু
– তুমি মুসলমান না খিরিস্টান?
– মানে?
– মানে আবার কী? দুধ খাও নি মিয়া? কথা বোঝো না? তুমি ইট ভাঁটির চকিদারি করার সময় তোমার বৌ-পোলা নিয়া মুসলমান হইছিলা কি না কও

ডেভিড অভয় দাস আবারও চুপ মেরে যায়। মিশন প্রতিনিধি কথার রেশ ধরেন– এভাবে চাপে ফেলে স্বীকারোক্তি নেয়া ঠিক না
– চাপ কিসের? কিসের চাপ? আমি তো তারে ভালো কইরাই জিগাইতাছি– কও মিয়া তুমি বৌ পোলা নিয়া কলেমা পড়ছিলা?
– পড়াইছিল
– কেডা?
– ইট ভাঁটির মালিক
আবারও মিশন প্রতিনিধি কথা ধরেন– সেটা লোভ দেখিয়ে
– কিসের লোভ? ওই মিয়া তোমারে মুসলমান হইবার লাইগা কেউ কিছু দিছিল?
– একটা লুঙ্গি আর টুপি

হুজুর একটু থতমত খেয়ে যান– এইডা ঠিক হয় নাই। তয় সেইডা হের দোষ যে তোমারে লুঙ্গি আর টুপি দিছে, তয় হের লাইগা তোমার মুসলমানিত্ব খারিজ হয় নাই। তুমি মুসলমান
– অবশ্যই না
কথা ধরেন মিশন প্রতিনিধি– ডেভিড অভয় দাস যখন বৌ ছেলে নিয়ে অসহায় অবস্থায় তখন একজন চাকরির লোভ দেখিয়ে তাকে কলেমা পড়ায়। তাকে মোহাম্মদ দাউদ আলী নামে চাকরি দেয়। কিন্তু ডেভিড অভয় দাস কোনোদিনও মুসলিম হয়নি। তার প্রমাণ সে এর পরেও নিয়মিত গির্জায় গেছে

রাত অনেক হয়ে গেছে। আলোচনা খাড়াবড়ি-থোড় আর থোড়বড়ি-খাড়াতেই ঘুরছে। ডালিমের বাবা যদি ডেভিড অভয় দাস হয় তবে ডালিমের শেষকৃত্য হবে খ্রিস্টান নিয়মে। আর সে যদি মোহাম্মদ দাউদ আলী হয় তবে শেষকৃত্য হবে মুসলিম নিয়মে। কিন্তু যে লোক এই সিদ্ধান্ত দিতে পারে সে লাজওয়াব

মিটিংয়ের অর্ধেক লোক যখন উঠে দাঁড়িয়ে এ ওর দিকে তেড়ে যাচ্ছে তখন শিখু দাস ডালিমের ঘর থেকে দৌড়ে এসে স্বামীকে ঝাঁকাতে থাকে প্রচণ্ড শক্তিতে– ও ডালিমের বাপ। মুসলমানেও মাটি পায়। খিরিস্টানেও মাটি পায়। তুমি হেগোরে কও না আমার পোলাটারে মাটি দিয়া আইসা ঠিক করতে হেয় মুসলমান না খিরিস্টান?
২০০৬.১১.২০